মানবমন

- ☐ ইতিহাসের দর্শন
- ☐ গান্ধী ও বিজ্ঞান
- ☐ রোবট বিদ্রোহ প্রসঙ্গে
- ☐ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ
- ☐ মনোবিদের ডায়েরী

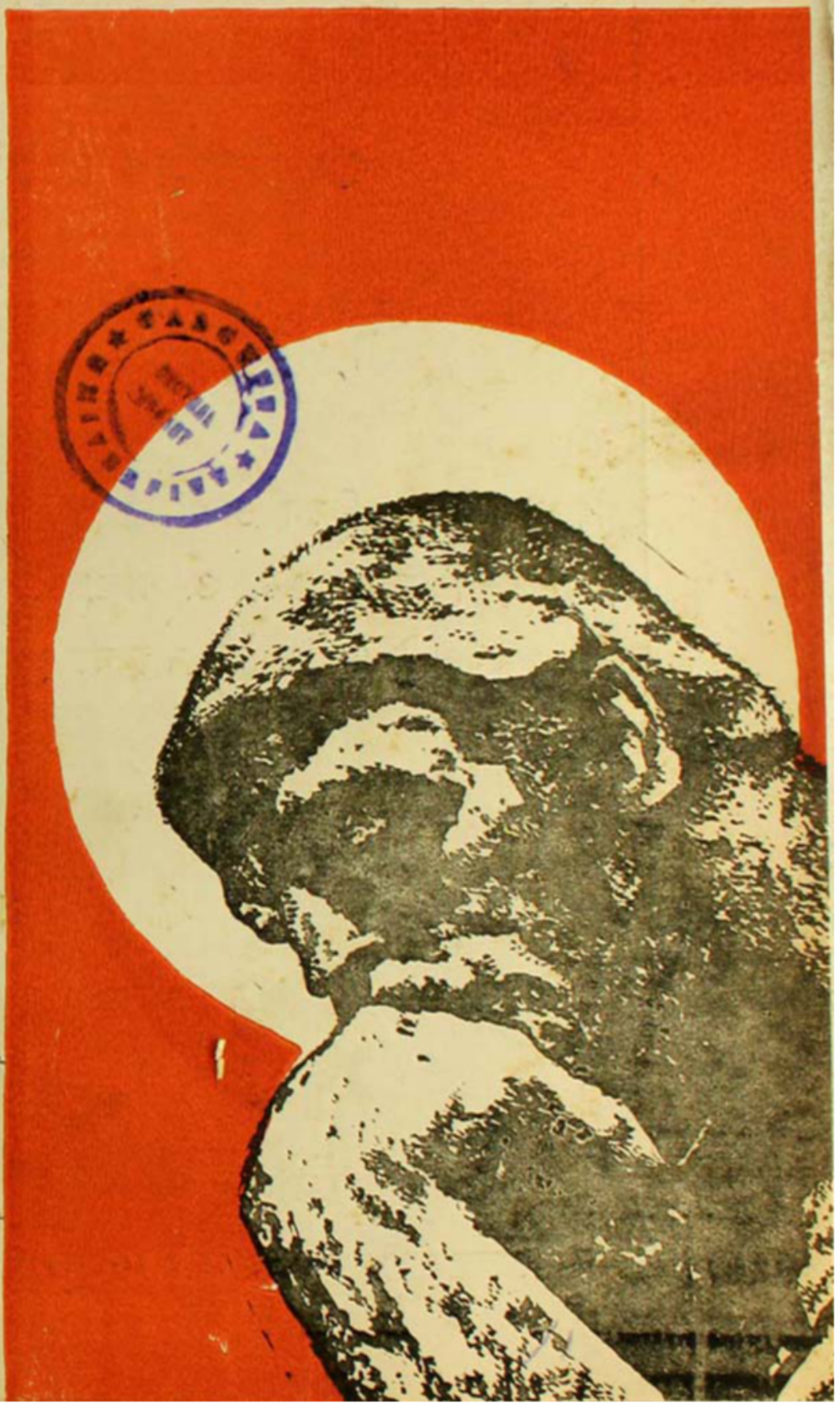

মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা-পরিচায়ক বাংলা ত্রৈমাসিক

মে দিবসের আহ্বান

যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে

গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে,
স্বৈরতন্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে,
শ্রমিক কর্মচারী ও মেহনতী মানুষের দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. পি. এ. ২৪০২ / ৮৯

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
প্রকাশিত গ্রন্থ

প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

একখণ্ডে ৭৪টি নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ সংকলন। তৎসহ লেখকপুত্র অমৃত রায় লিখিত জীবন পরিচয়। সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বই, রয়াল সাইজ। মূল্য ৪৫ টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১৮৬টি কবিতার সংগ্রহ। তৎসহ কবিকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয়। রয়াল সাইজ। ৪২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ টাকা।

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত প্রণীত
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সার্ধ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত জীবনী। মূল্য ২ টাকা।

আকাদেমি পত্রিকা / ১

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : অন্নদাশংকর রায়। মূল্য ১০ টাকা।

প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা

মূল্য : ১০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

(১) কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, (বেলা ২টো থেকে ৭টা)

(২) ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল কাউন্টার, ৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ (বেলা ১২টা থেকে ৬টা)

(৩) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

(৪) মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

(৫) দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. পি. এ. ২৫০১ / ৮৯

SARKAR PHARMACY

118/C, A. J. C. Bose Road,

Calcutta-700 014

With best compliments from :

LIST OF ITEMS

- FLUHEX—Trifluoperazine B. P. 5mg. Trihexyphenidyl Hcl. U.S.P. 2mg
- FLUHEXETTE—Trifluoperazine B. P. 2·5mg. Trihexyphenidyl U.S.P. 1mg.
- CHLORFLUHEX—Chlorpromazine Hcl. I. P. 50 mg. Trifluoperazine Hcl. B. P. 5mg. Trihexyphenidyl Hcl. U.S.P. 2mg.
- SOPOR-5—Nitrazepam B. P. 5mg.
- SOPOR-10—Nitrazepam B. P. 10 mg.
- SERAX—Diazepam I. P. 5mg.
- IMPRESS—Imipramine Hcl. I.P. 25mg.
- VIVAX-10—Amitriptyline (as Hcl.) I.P. 10mg.
- VIVAX-25—Amitriptyline Hcl. 25mg.
- REPOISE-10 --Thioridazine (as Hcl.) B.P. 10mg.
- REPOISE-25—Thioridazine Hcl. B.P. 25 mg.
- REPOISE-50—Thioridazine (as Hcl.) B. P. 50mg.
- CPZ-25—Chlorpromazine Hcl. I. P. 25mg.
- CPZ-50—Chlorpromazine—Hcl. I. P. 50mg.
- CPZ-100—Chlorpromazine Hcl. I. P. 100mg.
- TRIXYL—Trihexypenidyl Hcl. U. S. P. 2mg.
- ANXON—Chlordiazepoxide I. P. 10mg.
- NYTOIN—Phenytoin Sodium I. P. 100mg.

PharmaCia Laboratories

P-28, C. I. T. SCHEME, GARIAHAT ROAD (SOUTH)
CALCUTTA-700 031

We offer the following :

ANTIPSYCHOTICS

SCHIZONIL PLUS—Each tablet contains : Trifluoperazine Hydrochloride B. P. equivalent to Trifluoperazine 5mg. Trihexyphenidyl Hydrochloride USP 2mg.

DELNIL-25—Each coated tablet contains : Thioridazine Hydrochloride B. P. 25mg. Colour : Tartrazine Yellow.

DELNIL-50 – Each coated tablet contains : Thioridazine Hydrochloride B. P. 50mg. Colour : Amaranth.

ANTIDEPRESSANTS

NILDEP-25 —Each coated tablet contains ; Amitriptyline Hydrochloride I. P. 25mg. Colour : Erythrosine

NILDEP-50 —Each coated tablet contains : Amitriptyline Hydrochloride I. P. 50mg. Colour : Sunset Yellow

DIMIP-25—Each coated tablet contains : Imipramine Hydrochloride I. P. 25mg. Colour : Erythrosine

ANTIEPILEPTICS

EPNIL—Each tablet contains : Carbamazepine I. P. 200mg

MISCELLANEOUS

PEACEOXIDE 10—Each coated tablet contains : Chlordiazepoxide I. P. 10 mg. Colour : Tartrazine.

PARNIL—Each tablet contains : Trihexyphenidyl Hcl. U. S. P. 2mg.

PROMETH—Each coated tablet contains : Promethazine Hcl. I. P. 25mg Colour : Brilliant Blue.

TRANIPAM-5—Each tablet contains : Nitrazepam B. P. 5mg.

TRANIPAM-10—Each tablet contains : Nitrazepam B. P. 10mg.

REPAM-5—Each tablet contains : Diazepam I. P. 5mg.

D. D. PHARMACEUTICALS

25/7, BURRO SHIB TOLLA MAIN ROAD,

CALCUTTA-700 038

Phone : 45-5229, 49-3071

বিরল প্রতিভার অধিকারী ও গত কয়েক দশকের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তাঁর আপনজনের গভীর শোকে আমরা অংশীদার।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৭১
ইতিহাসের দর্শন : ই এইচ কার-এর শেষ চিন্তা : সৌমিত্র পালিত ৭৩
রোবট বিদ্রোহ প্রসঙ্গে : ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার ৮৬
গান্ধী ও বিজ্ঞান : প্রসেনজিৎ চৌধুরী ৯৪
মনোবিদের ডায়েরী : মনোবিদ ৯৯
চাণক্যের সমীক্ষায় মানবমন : কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ১০৪
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৮
বিবিধ : ১১৭
মনোবিদের জল্পনা : ১২৭

নিয়মাবলী

১. 'মানবমন' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। ২. প্রতি সংখ্যা ৮·০০ টাকা। অক্টোবর সংখ্যা ১৬·০০ টাকা। সডাক প্রতি সংখ্যা ৯·০০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সডাক ৪০·০০ টাকা অগ্রিম দেয়। বছরের যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। ৩. চেক কেবলমাত্র কলকাতার জন্য। ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার ইত্যাদি **PAVLOV INSTITUTE & HOSPITAL** অথবা **MANABMON**-এর নামে প্রদেয়। ৪. এজেন্সী বা ব্যবসাসংক্রান্ত শর্তাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। কমিশন ২৫%। ৫. অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি খরচ না দিলে গ্রাহকদের কাগজ বুক-পোস্টে পাঠান হয়।

পাভলভ ইনস্টিটিউট

১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

মানবমন

এপ্রিল-জুন বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২ ১৯৮৯

সম্পাদকীয়

বিচ্ছিন্নতা : বিক্রিয়তা, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা

মার্কস নির্ধারিত বিচ্ছিন্নতার তিনটি শর্ত : ব্যক্তিসম্পত্তি, শ্রেণীবিভাগ ও সামাজিক নিয়মশৃংখলার স্বতঃস্ফূর্তি আমাদের দেশে অতি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ফলে কর্মে অনীহা, আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ; বিশেষভাবে দেখা যায়। প্রায় সকলেই তাদের শ্রমফল থেকে বিচ্ছিন্ন। তার সঙ্গে আছে ঐতিহ্যিক রীতার উক্ত—যা ফলেরু কদাচন। ব্যক্তিপিছু উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান ক্রমশ নিম্নাভিমুখী এবং শ্রমফল থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ নিস্পৃহ। নিষ্ক্রিয়তা আমাদের মজ্জাগত। নিষ্ক্রিয় মানুষ সুযোগ পেলেই সরব ও প্রতিবাদে লোচ্চার। শুধু শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তিসত্তা, স্বচ্ছবুদ্ধি, যুক্তিভিত্তিক ধ্যানধারণা, সামগ্রিক চেতনা থেকেও আমরা বিচ্ছিন্ন। তাই আমাদের অসন্তোষ, চাপা প্রক্ষোভ, অসহায়তা, অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অপেক্ষাকৃত চতুর ও কর্মঠ লোক ছোটখাটো সংগঠন গড়ে তুলে দাবীদাওয়ার আন্দোলন চালাতে পারেন অনায়াসে। এই ধরনের আন্দোলনের তবু একটা ইতিবাচক দিক থাকে। বিচ্ছিন্ন মানুষ যখন ঐহিক ঐশ্বর্য ও পারলৌকিক পরামর্থ লাভের আশায় নিজেকে কোনো দাদাজি বাবাজি মাতাজির আশ্রমভুক্ত করে অপরের সঙ্গে অন্বিত হবার চেষ্টা করেন, তখন এই অন্বয়ের নেতিবাচক দিকটি সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার রূপে বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান। এইসব সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা, আমাদের মত তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে, নিজেদের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য, সংগঠন বা আশ্রমের মর্যাদা, সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্য ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির গাঁটছড়া বেঁধে ভক্ত ও ভলান্টিয়ারের রক্তে তীব্র উত্তেজনার মাদক অনুপ্রবিষ্ট করে তাদের বিচ্ছিন্নতার নিষ্ক্রিয়তা দূর করার চেষ্টা করেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ক্রীতদাস হবার সম্ভাবনার ভয় দেখিয়ে উন্মাদ করে তোলেন। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার মত একইভাবে দেশের আদিবাসী ও অন্যান্য ছোট ছোট পেছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীর মনে আতঙ্ক সংক্রমিত হয় এবং বিচ্ছিন্নতার প্রসার ও গভীরতা বাড়তে থাকে। অপরদিকে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মাতব্বররা পেছিয়ে থাকা ও এযাবৎকাল অনাদৃত অবহেলিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের এই সব দাবিদাওয়ার আন্দোলন দমনে, বৈধ-অবৈধ নানা উপায় অবলম্বন করেন, গোপনে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার মত ভাষাভিত্তিক ও জাতি-উপজাতিগত বিচ্ছিন্নতার ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। নিষ্ক্রিয়তার যন্ত্রণা দূরকরার জন্য ব্যক্তি যেমন মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে যাওক বা আত্মঘাতী হয়ে থাকেন ; এই সব ছোট বড় সংগঠনেও চলে নিজেদের মধ্যে কলহ ও অন্যদের উৎখাত করার পরিকল্পনানুযায়ী হিংস্র কার্যকলাপ। এক বন্ধু বাঙালী মানসিকতা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একদিন বলেছিলেন যে আমরা 'অ্যামিবার' জাত। আমাদের সব সংগঠন বেঁচে থাকবে : এক থেকে দুই, দুই থেকে চার হতে থাকবে। রহস্যচ্ছলে বললেও কথাটি সত্যি। আমাদের প্রতিষ্ঠান

ও সংগঠন ক্রমবিভাজনের ফলে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পাবে (বিশেষ করে রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থা)। সেগুলো আবার ভাঙবে, এক বিচ্ছিন্নতা থেকে—নিষ্ক্রিয়তা, যুক্তি বুদ্ধি ও চেতনার বিচ্ছিন্নতা থেকে যে কোনো একটা বলে ভিড়ে গিয়ে 'রোবটে' পরিণত হওয়া অথবা ফেলেরাখা নিঃসঙ্গতার জ্বালা ধূলীকরণের প্রচেষ্টায় অর্থহীন ধ্বংসাত্মক কাজে নিযুক্ত হওয়া—এই প্রক্রিয়াটি আমাদের নজরে পড়ছে।

বুরোক্রেসীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ক্রমশ বাড়ছে। শাসক ও নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণ ও ক্যাডারদের বিচ্ছিন্নতাও বাড়ছে। সেই বিচ্ছিন্নতার কিছুটা নিরসন ঘটছে বড় বড় জনসমাবেশে বছরে দুএকটার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতির ভাষণ শুনে। কিন্তু সেটা সাময়িক। ব্যক্তি-সম্পত্তি ও শ্রমবিভাজন যত দিন থাকবে, বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ বেড়েই চলবে। জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহতই থাকবে বলে আমরা মনে করি।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুললেই বিচ্ছিন্নতার নিরসন ঘটবে—তা কিন্তু আমরা মনে করি না। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার বীজ সুপ্ত থাকে এবং আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সময়সাপেক্ষ। পেরেস্ত্রইকা, গ্লাসনস্ত, চীনের ছাত্রবিপ্লব এই ধারণার পরিপোষক। সোভিয়েত রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান—১৯৭৮ সালে 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ'-এর ভূমিকায় একথা লিখে আমার অনেক হিতৈষী বন্ধু বান্ধবের বিরাগভাজন হয়েছিলাম। তবে আমি বিশ্বাস করি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবেই এবং বিচ্ছিন্নতার বিলোপ অনিবার্য।

বিচ্ছিন্নতার আবহাওয়ায় প্রতিষ্ঠান-বিরোধী নকশালবাড়ী আন্দোলন প্রভাবিত হয়ে গড়ে উঠেছে কয়েকটি নয়াবাম, অতিবাম সংগঠন। এই সংগঠনের অধিকাংশ ভক্তই সৎ। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই রাজনীতির মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও কেরিয়ার গঠনের প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষা হয়তো নেই। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার দাপট থেকে তাঁরা পরিত্রাণ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের আন্তরিকতার অভাব আছে বলছি না, কিন্তু তাঁরাও তাঁদের পূর্বসূরী বিপ্লবীদের মতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ও দলগতভাবে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন। গণবিজ্ঞানের প্রসার, কুসংস্কার দূরীকরণ ইত্যাদি অনেক জনহিতৈষী ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাকে অগ্রাধিকার দেবার ফলে তাঁদের নির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত কর্মসূচি রূপায়ণে তাঁরা সফল হবেন বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে তাঁরা জনসাধারণের একটি বৃহদংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। মধ্যপন্থী ও উগ্র প্রতিষ্ঠান-বিরোধীদের মধ্যেই তাঁদের সমাজ উন্নয়নকামী ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে। প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত বা কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত নয়—যাঁরা তাঁদের মত কাজকর্ম করছেন তাদের ঘুরে ঠেলে দিলে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁদের অভিমতের আমরা সমর্থক নই। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়ই। শুধু গণতন্ত্রে নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এর প্রয়োজনীয়তা এখন স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু নিজেদের প্রধান কর্মসূচি—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ইতিহাসের দর্শন :
ই. এইচ. কার-এর শেষ চিন্তা

সৌম্যেন্দ্র পালিত

॥ ১ ॥

ই এইচ. কার-এর 'ইতিহাসের স্বরূপ' (হোয়াট ইজ হিস্ট্রি) বইটি প্রথম বেরোয় ১৯৬১ সালে। অসাধারণ প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এই বইটি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইতিহাসের দর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা যে এত সরল যুক্তি দিয়ে এত সহজভাবে আলোচনা করা যায় তা কার-এর লেখা না পড়লে ভাবা যায় না। আর পুরো বইটি জুড়েই তিনি বারবার আমাদের বুঝিয়েছেন যে ইতিহাস আলোচনার অর্থ কোন অলস তত্ত্ববিলাস বা অর্থহীন ঘটনার সঙ্কলন নয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য অতীতকে জানা, বিশ্লেষণ করা এবং অতীতকে জানার মাধ্যমেই আমরা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারব। ফলে মানুষের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অগ্রগতিতে ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় অন্যতম হাতিয়ার।

কিন্তু একই সঙ্গে কার দেখিয়েছেন অতীতের জ্ঞান বা বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকদের সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে কীভাবে প্রভাবিত হয়। আর তারই ফলস্বরূপ কেমন করে ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। একজন সৎ ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হিসেবে মানুষের প্রগতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী কার তাঁর বইয়ের শেষে ভবিষ্যতের প্রতি এক আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করেন।

রজনী পাম দত্ত তাঁর 'সমসাময়িক ইতিহাসের সমস্যাবলি' (প্রবলেমস্ অফ্ কনটেমপোরারি হিস্ট্রি, লণ্ডন, ১৯৬৩)-তে বলেন, তাঁর বইতে কার পুরোপুরি না হলেও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি এসেছেন। আর দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহাসিক রূপরেখা' (এ কালচার অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন অফ্ অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া ইন হিস্টোরিক্যাল আউটলাইন, লণ্ডন, ১৯৬৫)-র ভূমিকায় ঐতিহাসিকের দায়িত্ব কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কার থেকে উদ্ধৃতি দেন।

১৯৬১ সালের প্রথম সংস্করণের পর নভেম্বর ১৯৮২-তে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কার তাঁর বইয়ের একটি পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ বার করার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণের শুধু মুখবন্ধটিই শেষ করতে পেরেছিলেন। পুরো বইটি পরিমার্জনের সময় আর পাননি।

নভেম্বর ১৯৮৪-তে বেরোয় তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ। এই পুনর্মুদ্রণে তাঁর প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধটি বার করা ছাড়াও ঐ সংস্করণের জন্য সংগৃহীত অসংখ্য মতামত, আলোচনা, সমালোচনা এবং কার-এর নিজস্ব বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অভিমত, মন্তব্য ও খসড়া লেখার একটি সংকলন তৈরি করেছেন তাঁর সহযোগী আর. ডব্লু. ডেভিস। ইনি কার-এর বলশেভিক বিপ্লবের উপর বিশাল লেখার একটি অংশের সহলেখক ছিলেন। আমাদের বর্তমান আলোচনার ভিত্তি ডেভিস-এর এই সঙ্কলন।

। ২ ।

প্রায় কুড়ি বছর আগের পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়ে কার তাঁর পরিকল্পিত দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধটি শুরু করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, ১৯৬০ সালে পৃথিবী তখনো দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়া ও চীনের দুই বিশাল বিপ্লবের অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভিক্টোরীয় যুগের লক্ষণ—সরলভাবে আত্মশক্তিতে আস্থা ও অগ্রগতির উপর সহজাত বিশ্বাস—সে সময় অনেক দূরের জিনিস। পৃথিবী এক বিক্ষুব্ধ, এমনকি ভয়াবহ স্থান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পান যার থেকে বোঝা যায়, মানুষ কয়েকটি সংকট কাটিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। যেমন, যুদ্ধের পরিণাম হিসেবে যে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেই সংকট কিন্তু আসেনি; নিঃশব্দে এবং প্রায় অলক্ষিতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি। হাঙ্গারী (১৯৫৬) ও যুদ্ধের সমস্যা বিস্ফোরক অবস্থায় পৌঁছোয়নি; রাশিয়া ও আমেরিকার যথাক্রমে স্তালিন ও ম্যাকথির নঞর্থক প্রভাব অপসারণের দিকে প্রশংসনীয় অগ্রগতি; ফ্রান্সের পর জার্মানি ও জাপানের চমকপ্রদ উন্নতি; যুক্তরাষ্ট্রে কেনেডি যুগের নতুন আশার সম্ভাবনা; দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া ও ভিয়েতনাম সমস্যাকে যুদ্ধে পরিণত রাখা এবং শেয়ার বাজারের তেজীভাব—এ সবই ১৯৬১ সালের ঘটনা।

ঐ বছর ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস ও আশা রেখে কার তাঁর বই শেষ করেন। তিনি মনে করেন, এই ধরনের সমাপ্তির পেছনে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন লক্ষণ অন্তত আপাতগ্রাহ্য যৌক্তিকতা সৃষ্টি করেছিল।

এরপর তিনি পরবর্তী কুড়ি বছরের দিকে নজর দেন। এই দুই দশকের ঘটনা কিন্তু ৬১ সালের আশা ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এই সময় ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছে বিগুণ তীব্রতায়, সঙ্গে আছে পারমাণবিক বিলুপ্তির ভীতি; বিলম্বিত অর্থনৈতিক সংকট শিল্পোন্নত দেশগুলিকে তছনছ করে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকিয়ে বসেছে; সমস্ত পশ্চিমী সমাজে বেকারত্ব ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করছে; মধ্যপ্রাচ্যে তেলের দেশগুলির বিদ্রোহের ফলে পশ্চিমী শিল্পনির্ভর বিভিন্ন দেশে সংকট; নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সক্রিয় ও উদ্বেগজনক ভূমিকা গ্রহণ, হিংসা ও উগ্রবাদ থেকে প্রায় কোন দেশই মুক্ত নয়।

এই পরিস্থিতিতে যে কোন রকম আশার অভিব্যক্তি যেন অর্থহীন। আশার ধ্বংসের বর্ণনা ছিল চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী সাংবাদিকদের পরিশ্রম করে তৈরি করার উপাদান। কিন্তু তা এখন দৈনন্দিন কথাবার্তার অঙ্গবিশেষ। পৃথিবী শেষ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত জনপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণী এর আগে কখনোই এত প্রযোজ্য মনে হয়নি।

এই অবধি আলোচনা করে কার কিন্তু একটি সীমারেখা টেনে দেন। মানুষের সাধারণ বোধের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব হতাশাজনক ঘটনাকে কখনোই ক্ষুদ্রাত্ম বলে মনে হয় না। প্রথমত, ভবিষ্যতের নিরাশ বিশ্লেষণ অনস্বীকার্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হলেও তা একটি বিকৃত তাত্ত্বিক প্রকল্প। জনগণের বড় অংশ এই নিয়ে মাথা ঘামায় না—তাদের ব্যবহারেই তা প্রমাণিত। তারা প্রচুর নিষ্ঠা নিয়ে ভালোবাসে, সন্তানদের জন্ম দেয় ও তাকে মানুষ করে। পরবর্তী প্রজন্মকে সুখী করার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে প্রচণ্ড মনোযোগ দেওয়া হয়। নতুন নতুন শক্তির উৎস সন্ধানের উৎসাহে কখনোই ভাঁটা পড়ে না। বিভিন্ন আবিষ্কার সবসময়ই উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে। অগণিত 'ক্ষুদ্র সফরী'

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। আগামী প্রজন্মের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৈতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে দেখা যায় বিপুল উৎসাহ। ফলত, আমরা জানি বিশ্বাস একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন সংশোধন করা মুস্কিল।

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে কার-এর দ্বিতীয় আপত্তি তার ভৌগোলিক উৎস নিয়ে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর উৎপত্তি প্রধানত বা সম্পূর্ণতই পশ্চিম ইউরোপে ও তার সাগরপারের শাখাপ্রশাখায়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বিগত পাঁচ শতক ধরে এইসব দেশ ছিল পৃথিবীর একচ্ছত্র প্রভু। বাইরের পৃথিবীর অসভ্য অন্ধকারের মধ্যে আলোকিত সভ্যতার প্রতিভূ তারাই—এইসব দেশের এই দাবির পেছনে অন্তত আপাত যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল। অতএব, যে মুহূর্তে এই দাবি ক্রমেই বর্জিত ও প্রতিহত হয় সে মুহূর্ত নিঃসন্দেহে বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করে। আর ব্রিটেন যে এই বিক্ষোভ ও গভীরতম মননগত নিরাশার কেন্দ্র তাও অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ আর কোন দেশেই ঊনবিংশ শতাব্দীর জাঁকজমক ও প্রভুত্ব এবং বিংশ শতাব্দীর বিবর্ণতা ও হীনমন্যতা এত পরিস্ফুট ও বেদনাদায়ক নয়। এই মানসিকতা পশ্চিম ইউরোপ ও খানিকটা উত্তর আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব দেশই ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশ বিস্তারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা বলে এই একই মানসিকতা যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শক্তিশালী সেরকম ভাবার কোন কারণ নেই। যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনতিক্রমণীয় বাধা ও অবিরাম ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রচারের ফলে রাশিয়া সম্পর্কে কোন যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসা শক্ত। কিন্তু যে দেশে জনগণের বৃহত্তর অংশ আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে সেখানে—তাদের এখন যত অভিযোগই থাক না কেন—ভবিষ্যতের প্রতি এক সর্বব্যাপী হতাশা আছে এরকম বিশ্বাস করা অসম্ভব। এশিয়ায় জাপান ও চীন তাদের নিজ নিজ পদ্ধতিতে আগামী দিনের পরিকল্পনা করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে উত্থানপতন চলছে সেখানেও বিভিন্ন উদীয়মান জাতি তাদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করে চলেছে—সে ভবিষ্যৎ যেরকমই হোক না কেন।

এইভাবে পর্যালোচনা করার পর কার তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর মতে বর্তমানে যে সংশয়বাদ ও হতাশার হাওয়া বইছে, যার সামনে শুধুমাত্র অংশ ও অবক্ষয় এবং যে কোন ধরনের প্রগতি বা মানব-জাতির অগ্রগতিকে বা অর্থহীন মনে করে তা হলো 'এলিট' বা অভিজাতীদের মতবাদ। অর্থাৎ এক অভিজাতী শ্রেণীর মতবাদ যাদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধে বর্তমান সংকটের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই মতবাদের ধারক ও বাহক হলেন বিভিন্ন অভিজাতবাদী (এলিটিস্ট) দেশের অভিজাতী শ্রেণী যাদের পৃথিবীর বাকি অংশের উপর প্রভুত্ব চূড়ান্ত হয়ে গেছে, কারণ যে কোন সমাজের ধ্যানধারণা হলো আসলে তার শাসকশ্রেণীর ধ্যানধারণা।

এই বিষয়ের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সমাজের সব স্তর থেকেই, তা যতই রুদ্ধদ্বার হোক না কেন, কিছু সংখ্যক ভঙ্গ ও বিক্ষুব্ধের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষভাবে প্রবল। সমাজের প্রধান প্রধান স্বীকৃত রীতিনীতিকে সাধারণভাবে মেনে নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে চিরাচরিত তর্কবিতর্ক হয় এখানে কিন্তু তার কথা বলা হচ্ছে না। বরঞ্চ বলা হচ্ছে এইসব রীতিনীতির উপযোগিতা নিয়ে বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন, বিচার ইত্যাদি। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক সমাজে এইসব প্রশ্ন ও

বিচার ততক্ষণই সহ্য করা হয় যতক্ষণ তা বৃত্তিমের বিক্ষুব্ধতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নেতিবাদীরা বলতে পারেন যে এই বিক্ষুব্ধতের সহ্য করার কারণ তাঁদের সংখ্যা বা প্রভাব কোনটাই যথেষ্ট নয়।

নিজের সম্বন্ধে কার বলেছেন যে গত চল্লিশ বছর ধরে তিনি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা বহন করেছেন। আর সাম্প্রতিককালে তিনি ক্রমেই নিজের ও অন্যদের কাছে মননগত দিক দিয়ে বিক্ষুব্ধ বলে পরিচিত হচ্ছেন। এর সহজ কারণ হতে পারে তিনি নিশ্চয়ই সেই বুদ্ধিজীবীদের দলে আছেন যাদের জন্ম ভিক্টোরীয় যুগের প্রবল প্রতাপের মধ্যে নয় বরঞ্চ তার পরবর্তী বিশ্বাস ও আশার পর্যায়ে। ফলে পৃথিবী যে এক চিরস্থায়ী ও উদ্ধারহীন অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এইভাবে চিন্তা করা তাঁর পক্ষে আজও কঠিন।

অতএব, তাঁর পরিকল্পিত দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধের শেষ কথা হিসেবে তিনি বলেছেন, পশ্চিমী বিশেষ করে তাঁর স্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রচলিত ধারার থেকে তিনি এই বইয়ে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। সেই সঙ্গে তিনি দেখাতে ইচ্ছুক কীভাবে এবং কেন তাঁরা বিপথগামী হয়েছেন। আর তাঁর বইয়ের শেষ উদ্দেশ্য হবে ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী না হলেও অন্তত আরো যুক্তিগ্রাহ্য ও ভারসাম্য সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার সমর্থনে বক্তব্য উপস্থিত করা।

॥ ৩ ॥

আগেই বলা হয়েছে যে কার তাঁর প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধটির বেশি আর কিছু লিখে যেতে পারেননি। আমরা এতক্ষণ সেই মুখবন্ধের আলোচনা করলাম। কিন্তু তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে প্রথম সংস্করণ সংক্রান্ত অসংখ্য সমালোচনা, চিঠিপত্র, ছোট ছোট কাগজে হাতে লেখা বা টাইপ করা মন্তব্য ইত্যাদি পাওয়া যায়। এইসব মন্তব্যের অনেকগুলিই নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বাক্য বা অনুচ্ছেদের প্রথম খসড়া। আইজাক ডয়েচার, আইজায়া বার্লিন, কোয়েস্টলার ভিন্নার ইত্যাদির সঙ্গে ইতিহাসের দর্শন ও পদ্ধতি নিয়ে পত্র-বিনিময়ও পাওয়া যায়। ইতিহাস—সাধারণ; কার্যকারণবাদ—নির্ধারণবাদ—প্রগতি; সাহিত্য ও শিল্প; বিপ্লব ও হিংসার তত্ত্ব; রুশ বিপ্লব; মার্কসবাদ ও ইতিহাস; মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ—এই কয়েকটি শীর্ষকও দেখা যায় তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে। বোঝা যায়, তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য তিনি আরো গবেষণা করতে চেয়েছিলেন। ফলে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলেও একটি টুকরো লেখায় পাওয়া যায়—ইতিহাসের বিশৃঙ্খলা; সংখ্যাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের আক্রমণ; গঠনমূলবাদ (স্ট্রাকচারালিজম)—সাহিত্যের বিশৃঙ্খলা, ভাষাতত্ত্ব; কল্পস্বর্গ ইত্যাদি। আর অন্য একটি টুকরো কাগজে লেখা আছে, শেষ অধ্যায়; কল্পস্বর্গ, ইতিহাসের অর্থ।

অসংখ্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর এইরকম ছোট ছোট অভিমত ও মন্তব্য থেকে অনেক সময়ই মনে হয় যে একটি নতুন বইয়ের গঠন যেন ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে উঠছে যার বিষয়বস্তু হবে বর্তমানের অসন্তোষ ও আগামী যে পৃথিবীর জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আমাদের বর্তমান লেখায় আমরা কার-এর এইসব বিক্ষিপ্ত অভিমত ও মন্তব্য থেকে ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁর শেষ ভাবনাচিন্তার যে রূপরেখা পাওয়া যায় তা বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

ঐতিহাসিক : তাঁর তথ্য ও তাঁর সমাজ

এই দুই বিষয়ে কার তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণে যে অভিমত দিয়েছিলেন তা পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগবাদী (এমপিরিসিস্ট) দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি বিশ্লেষণ ও বর্জন করেন এই বলে, যে এটি এক ধরনের বিশ্বাস যার অর্থ সব রকমের সমস্যাকে কোন এক বৈজ্ঞানিক মূল্যহীন পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা যায়, অর্থাৎ একটি বিষয়নিষ্ঠ সঠিক সমাধান ও সেখানে পৌঁছানোর উপায় আছে। বা অন্য কথায়, বিজ্ঞানে গৃহীত অনুমান পদ্ধতিকে সমাজবিজ্ঞানে প্রতিস্থাপিত করা। তিনি লক্ষ্য করেন, লুকাচ রাঙ্কে-কে ইতিহাস-বিরোধী বলেছিলেন, কারণ রাঙ্কে শুধু বিভিন্ন ঘটনা, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের এক সঙ্কলন তৈরি করেছিলেন। একটির থেকে অপরটিতে অগ্রগতি সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণই করেননি। কার-এর বিভিন্ন মন্তব্যে প্রয়োগবাদের উপর এই আক্রমণ বিষয়ে পর্যাপ্ত সমর্থন পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক ও তাঁর পদ্ধতি

তাঁর মতে সাম্প্রতিক রাজনীতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত ইংরাজি লেখাপত্রের দরিদ্রতা ও অগভীরতার মূলে আছে ইতিহাসগত পদ্ধতির পার্থক্য, যে পার্থক্য মার্কস-কে ইংরাজিভাষী চিন্তাবিদদের থেকে এত স্বতন্ত্রভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এর কারণ ইংরাজীভাষী পৃথিবীতে আছে এক গভীর প্রয়োগবাদী ঐতিহ্য, তথ্যই তার নিজের সম্বন্ধে বক্তব্য রাখে। কোন এক অযৌক্তিক ও সম্ভবত অচেতন প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ডে বিষয়, ঘটনা ও পর্যায়কে ইতিহাসচর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এই সবই মার্কস-এর কাছে বিশ্বাসযোগ্য কারণ হতো। তিনি প্রয়োগবাদী ছিলেন না। সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে অংশের চর্চা, তাৎপর্যবিহীন তথ্য, কার্য বা কারণ বাদ দিয়ে ঘটনার বিচার, সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিশেষ সংকট এই সবই মার্কস-এর কাছে পণ্ডশ্রম বলে মনে হতো।

এই ধরনের পার্থক্যের ঐতিহাসিক মূল আছে। একটি সুসংবদ্ধ সামাজিক বিন্যাস, যার ভাঙাগড়া নিয়ে কোন সন্দেহ উঠে না, সেখানে প্রয়োগবাদ ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে সবসময়ই সাহায্য করে। আর এইরকম পৃথিবীর আদর্শ উদাহরণ উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেন। কিন্তু যে সময় প্রত্যেক ভিত্তিভূমিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং আমরা এক সংকট থেকে আরেক সংকটের আবর্তে পড়তে থাকি তখন প্রয়োগবাদ যথেষ্ট নয়।

কার বলেন, মানুষের যুক্তিবুদ্ধি (র‍্যাশনালিটি) কী নিয়ে গঠিত সে বিষয়ে একটি বিশেষ ধারণার অর্থই হলো ইতিহাস। আর প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই এই ধারণা আছে, তা তিনি জানুন বা না জানুন।

ইতিহাসজ্ঞানের আপেক্ষিকতা

ইতিহাসকারের তথ্য নির্বাচন ও বিচারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণে তিনি প্রচুর আলোচনা করেছেন। আর প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণের লেখাপত্রে তিনি ইতিহাসজ্ঞানের আপেক্ষিকতার সমর্থনে আরো উদাহরণ সংগ্রহ করেন। পাসির যুদ্ধে এথেন্সের ভূমিকার

হেরোডোটাস তার আধিপত্যের নৈতিক সমর্থন খুঁজে পান। যাযাবর জীবনযাত্রার সহানুভূতি আরবদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচণ্ড প্রভাবিত করেছিল। ফলে আরবদের কাছে ইতিহাস ছিল এক নিয়মবিচ্ছিন্ন বা চক্রাকার পদ্ধতি যেখানে শহর বা মরুদ্যানে বসবাসকারীদের মরুভূমির যাযাবরেরা উৎখাত করে এবং তারা নিজেরাও আবার নতুন যাযাবরদের হাতে স্থানচ্যুত হয়। এর বিপরীতে আঠেরো শতকের ইংল্যাণ্ডে গিবন-এর কাছে ইতিহাসের অর্থ "প্রতিটি যুগ প্রকৃত সম্পদ, সুখ, জ্ঞান ও সম্ভবত মানবজাতির গুণ বর্ধিত করেছে এবং এখনো করে চলেছে।" গিবন-এর এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ এক দীর্ঘকালব্যাপী সুস্থিত সভ্যতা একটি আত্মবিশ্বাসী শাসকশ্রেণীর জন্ম দেয়। আর তিনি ইতিহাসকে দেখেছিলেন সেই শাসকশ্রেণীর সুবিধাজনক অবস্থান থেকে। কার মন্তব্য করেন, বিপ্লবী যুগ ইতিহাস চর্চায় বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। ইতিহাসে আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিপ্লব এক অদ্বিতীয় বিষয়। মানুষের প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে একটি ইতিহাস নিরপেক্ষ ধারণাই ছিল জ্ঞানের দীপায়ন (এনলাইটেনমেণ্ট) পর্বের ভিত্তি। কিন্তু সেই ধারণা তুচ্ছ হয়ে যায় ফরাসী বিপ্লবের অভিঘাতে। মেকলে যখন সমসাময়িকদের বলেন "যে মানুষ ১৭৮৯, ১৭৯৪, ১৮০৪, ১৮১৪ ও ১৮৩৪-এ বিপ্লব সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করে সে হয় ঐশ্বরিক-ভাবে অনুপ্রাণিত ভবিষ্যদ্রষ্টা অথবা একগুঁয়ে বুদ্ধিহীন" তখন তিনি শুধু যা বলা উচিত ঠিক তাই বলছিলেন।

ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠা (অবজেকটিভিটি)

তাহলে ইতিহাসজ্ঞানের এই আপেক্ষিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়নিষ্ঠ (অবজেকটিভ) ইতিহাসের অস্তিত্ব কী অর্থে পাওয়া যায়? তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণে কার বলেন, কোন ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ইতিহাস বহির্ভূত বিষয়নিষ্ঠা দাবি করতে পারেন না। কিন্তু সমাজ ও ইতিহাসে নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে সীমাবদ্ধ মননদৃষ্টির (ভিশন) উপরে উঠবার ক্ষমতা যার আছে এবং যিনি নিজস্ব মননদৃষ্টিকে ভবিষ্যতের প্রতি এমনভাবে প্রসারিত করতে পারেন যাতে অতীত সম্পর্কে আরো গভীর ও স্থায়ী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় তাঁকে 'বিষয়নিষ্ঠ' ঐতিহাসিক বলা যায়।

'বিষয়নিষ্ঠা'র প্রতি কার-এর এই দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বলেন বিষয়নিষ্ঠা বিচারের ক্ষেত্রে কোন স্থির ও অপরিবর্তনীয় মানদণ্ড নিরূপণ করা যায় না। এই মানদণ্ড ভবিষ্যতের প্রতি প্রসারিত এবং ইতিহাসের অগ্রগতির ধারায় তা গড়ে উঠে। স্পষ্টতই বোঝা যায় ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠার সমস্যাটি থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 'চূড়ান্ত ও সময়নিরপেক্ষ বিষয়নিষ্ঠা'কে একটি 'অবাস্তব বিমূর্ততা' রূপে বর্ণনা করে তিনি লেখেন: বিষয়নিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক একটি নীতি বা রীতি গ্রহণ করেন। তারই মাধ্যমে ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয় অতীত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস করা হয়। ফলত এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্য আরোপের উপাদানটি এসে পড়ে। এটি বাদ দিলে অতীত অসংখ্য, বিচ্ছিন্ন ও তাৎপর্যহীন ঘটনার এলোমেলো সংগ্রহে পরিণত হয় ও ইতিহাস একবারেই লেখা যায় না।

ইতিহাস ও প্রকৃতিবিজ্ঞান

ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠার সমস্যাটিকে কার অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণ করেছিলেন। পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্যের বিষয়টি তিনি বিচার করেন। এক্ষেত্রে পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্য আরো প্রকট হয়। বিভিন্ন প্রকল্প ও তথ্যের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা নানারকম আবিষ্কার করেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের মতোই ইতিহাসের বিচার্য বিষয় হলো বিভিন্ন বিশেষ ঘটনা নয়—যা অনেক সময়ই মনে করা হয়—বরঞ্চ বিশেষ ও সাধারণের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ঐতিহাসিক সাধারণীকরণের প্রতি সাগ্রহ। তিনি বিশেষের প্রতি আগ্রহী নন, সাধারণের মধ্যে যা বিশেষ তাই তাঁর আগ্রহের বিষয়।

নতুন সংস্করণের জন্য বিজ্ঞানে প্রযুক্ত পদ্ধতি বিষয়ে কার বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন অভিমত সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব বিক্ষিপ্ত সংগ্রহ থেকে এই বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন : আইনস্টাইন ১৯২৪ সালে হাইজেনবার্গ-কে বলেছিলেন, আপনি কোন বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে পারেন কি না পারেন তা আপনার ব্যবহৃত তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। কী পর্যবেক্ষণ করা যাবে তা স্থির করে তত্ত্ব। বা, অভূতপূর্ব ঘটনার অর্থ এই নয় যে, প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে। আবার, বিরাট বিস্ফোরণ থেকে বিশ্বের সৃষ্টি এবং পরিণতিতে তা কালো গহ্বরে লুপ্ত হয়ে যাবে এই তত্ত্ব বর্তমান যুগের সাংস্কৃতিক হতাশার প্রতিফলন। এইরকম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত লেখা থেকে দেখা যায় কার-এর কাছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আপেক্ষিকতার বিষয়টি আগের চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। বৈধ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প মাত্রই যে নিখুঁতভাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার ক্ষমতা রাখে তার কোন মানে নেই, যদিও প্রায়ই তা মনে করা হয়। কিছু কিছু প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রকল্পের সঙ্গে ইতিহাসের সাধারণীকরণের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

কার্যকারণ সম্পর্ক

এই সম্পর্ক নিয়ে কার প্রথম সংস্করণে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য তিনি ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে ম'তেস্কিয়ো-র বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। ম'তেস্কিয়ো বলেছিলেন, "বিভিন্ন কারণের যত বেশী সাধারণ প্রভাব থাকে তারা তত কম বিশৃঙ্খল হয়। ফলে ব্যক্তির বিশেষ মানসিকতা কিসে গড়ে উঠে তা জানতে পারার চেয়ে আমরা কোন জাতির নির্দিষ্ট চরিত্র কী ভাবে গড়ে ওঠে সেটি আরো ভালোভাবে জানতে পারি।" আর তক্‌ভিল-এর 'প্রাচীন ও সাধারণ কারণসমূহ' এবং 'বিভিন্ন বিশেষ ও সাম্প্রতিক কারণ'-এর পার্থক্যকে কার যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন। কারণ সাধারণের অর্থ দীর্ঘকালব্যাপী আর ঐতিহাসিকের তাতেই আগ্রহ।

ইতিহাসে আকস্মিকতা

কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী, সাধারণ বা তাৎপর্যপূর্ণ এইরকম ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করলেই ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকা সংক্রান্ত সমস্যা এসে পড়ে। আকস্মিকতা যে ইতিহাসের

ধারা পরিবর্তন করতে পারে কার তা স্বীকার করেছিলেন। যেমন ১৯২৪ সালে রাশিয়ায় লেনিন-এর অকাল মৃত্যুর প্রভাব। কিন্তু ফলে যা ঘটেছিল তার 'প্রকৃত' কারণ লেনিন-এর মৃত্যু নয় এই অর্থে যে অন্যান্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হিসেবে ঐ কারণটিকে প্রয়োগ করা যায় না। কার-এর মতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চর্চা করার মত যথেষ্ট ধারাবাহিকতা ইতিহাসে পাওয়া যায়; যদিও মাঝে মাঝে বিভিন্ন বহিরাগত ঘটনা এই ধারাবাহিকতাকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

ব্যক্তির ভূমিকা

আকস্মিকতার সমস্যাটি, ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা, এই বিশেষ আকস্মিকতার ক্ষেত্রে আরো বিপত্তি সৃষ্টি করে। কার এই বিষয়টি নিয়ে বহুবার ভেবেছেন এবং শেষত প্রস্তাব করেন: ব্যক্তির চর্চা হলো 'একটি অন্তর্বর্তী মতবাদ।' কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার একমাত্র অর্থ হতে পারে নৈর্ব্যক্তিক জনতার পটভূমির বিপরীতে ব্যক্তিকে স্থাপন করা। আলতাস হাক্সলি ব্যক্তির ভূমিকার উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। আর সার্ত্র-এর 'সত্তা ও শূন্যতা' (বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস)-র 'নিজের জন্য' অস্তিত্ব ও 'নিজের মধ্যে' অস্তিত্ব এই দুটি পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমটির অর্থ ব্যক্তির বিশুদ্ধ সচেতনতা, চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব আর দ্বিতীয়টির অর্থ বস্তুসত্ত, বিষয়নিষ্ঠ ও অচেতন পৃথিবী। আবার ফ্রয়েড-এর কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতার সম্ভাবনার সৃষ্টি নয়, বরঞ্চ সভ্যতার প্রভাব ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

ব্যক্তি সমাজের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও তাকে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা উচিত—এই মতটি একটি দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ধারার সঙ্গে জড়িত। এই ধারা অনুযায়ী কিছু ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হয়েও ক্রিয়াশীল হতে পারেন এবং ইতিহাসে মহামানবদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ তারই প্রতিফলন।

সমাজের থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ইচ্ছার চূড়ান্ত ভূমিকার বিরুদ্ধে মার্কস বলেছিলেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রারম্ভিক বিন্দু রূপে গণ্য করে তা অর্থহীন। মানুষ প্রথমত একটি জৈব অস্তিত্ব এবং ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় নিজেকে ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কার্যকলাপ যে তাঁদের নিজস্ব শক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না—এই প্রসঙ্গে তকভিল মন্তব্য করেছিলেন, সমস্ত সভ্য মানুষদের মধ্যে রাজনীতির বিজ্ঞান বিভিন্ন সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করে বা অন্তত তাদের রূপ দেয়। এই সমস্ত সাধারণ ধারণা থেকে সমস্যার উৎপত্তি হয় যার মধ্যে রাজনীতিকরা সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়, আইন প্রণয়ন করে ও ভাবে যে এইসব আইন তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। রাজনীতির বিজ্ঞান এক ধরনের মননগত পরিবেশ তৈরি করে যেখানে শাসক ও শাসিত দুজনেই প্রাণধারণ করে। আর তাদের নিজেদের অজান্তে এই পরিবেশ থেকে তাদের ক্রিয়াকলাপের নীতি নির্ধারিত হয়।

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে কার মূলত মার্কস ও তকভিল-এর দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন। ব্যক্তি মানসিকতা কীভাবে কাজ করে তা ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁর মনে হয়নি। ইতিহাসকে সচেতন ব্যক্তিগত ব্যবহারের ভিত্তিতে না দেখে বরঞ্চ অবচেতনে ধৃতবদ্ধ মানুষের পরিস্থিতি ও মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত। এই বিষয়ে তিনি তির্যক মন্তব্য করেন, হিটলার সংক্রান্ত যে কোন বই শুরু

হয় হিটলারের ব্যক্তিত্বের উপর সবকিছু আরোপ করে আর শেষ হয় জার্মানীর রাজত্বের অস্থিরতা ও অক্ষমতার বিশ্লেষণে।

কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা তাৎপর্যহীন—টলস্টয়-এর এই প্রান্তবাদী অবস্থানও কার সমর্থন করেননি। তিনি স্বীকার করেন যে এই বিষয়টি তাঁর কাছে এখনও আকর্ষণীয় ও সমস্যাসঙ্কুল।

সোভিয়েত ইতিহাসে লেনিন-এর মৃত্যুর প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, যদিও ধরে নেওয়া যায় যে, পরিণামে সবকিছুই ঠিক একইরকম হতো তাহলেও একটি মধ্যবর্তী পর্যায়ের কথা ভাবতে হবে। আর এই পর্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রচুর সংখ্যক মানুষের কাছে তা যথেষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি করে। এই অংশে আকস্মিকতার বিষয়ে তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণের সঙ্গে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। একটি সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে তিনি চমকপ্রদ মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি ও জিদের দশকে লেনিন যদি তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও একইরকম সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতেন। সেক্ষেত্রে তিনিও স্তালিন-এর পদ্ধতিতেই সমাধান করার চেষ্টা করতেন, যদিও এই প্রক্রিয়ায় তিনি বলপ্রয়োগের বিষয়টি ন্যূনতম ও সহনীয় করে তুলতেন। লেনিন কখনোই স্তালিন-এর মতো বিকৃত তথ্যের প্রস্তুতি করতেন না।

রুশ আমলাতন্ত্রের সনাতন ও নিষ্ঠুর ঐতিহ্যের সঙ্গে স্তালিন-এর ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়ে উপর থেকে সন্ত্রাসারিত বিপ্লবের উপর একটি বিশেষ নৃশংস রূপ আরোপ করেছিল। 'উপর থেকে বিপ্লব সন্ত্রাসারণের' বিভিন্ন দীর্ঘকালীন কারণ মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা যায়, আর ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব এইসব কারণের চর্চা, বলপ্রয়োগের ব্যাপ্তির বিষয়টি হলো ইতিহাসে আকস্মিকতা।

মার্কসবাদের প্রভাব

গত ষাট বছরের ইতিহাসচর্চায় মার্কসীয় প্রভাবকে কার একটি প্রধান ধারা রূপে গণ্য করেন। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তাঁর মতে প্রায় সবরকমের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসচর্চাকে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে যুদ্ধ, কূটনৈতিক কার্যকলাপ, সাংবিধানিক যুক্তিতর্ক এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আর ইতিহাসের মুখ্য বিষয়বস্তু রূপে পরিগণিত হয় না। তার পরিবর্তে এসেছে অর্থনৈতিক উপাদান, সামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যাতত্ত্ব এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উত্থানপতন সম্পর্কিত আলোচনা। সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাও এই বিকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রভাব লক্ষ্য করে কার বলেন, এই দুটি বিষয়ের পারস্পরিক ঝোঁক যত বেশি হয় ততই ভালো।

ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা

কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া ও সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যকে ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করাকে কার রক্ষণশীল ও এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা রূপে চিহ্নিত করেন। কারণ পরিবর্তনের বিভিন্ন মৌলিক প্রক্রিয়া চর্চাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এইসব প্রক্রিয়া যদি কারো ভালো না লাগে তাহলে তিনি সমাজবিজ্ঞানে আশ্রয় নিতে পারেন। আজ নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির বিকাশ হচ্ছে এবং ইতিহাস অসুস্থ। কিন্তু আমাদের সমাজও তো অসুস্থ।

ইতিহাস ও গঠনমূলবাদ (স্ট্রাকচারালিজম)

ইতিহাসের ক্ষেত্রে গঠনমূলবাদ নিয়েও কার ভেবেছেন, তিনি শিক্ষাতে আনেন এই তত্ত্ব মোটের উপর ইতিহাসচর্চার অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তারকারী। গঠনমূলবাদ সমাজের বিভিন্ন অংশ বা বৈশিষ্ট্যকে তাদের ক্রিয়াশীল বা গঠনমূলগত আন্তঃসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। একে তাই 'অনুনুমিক দৃষ্টিভঙ্গি' বলা যায়। এর বিপরীতে ঐতিহাসিক বা 'উন্নয়' দৃষ্টিভঙ্গির বিচার্য বিষয়: ইতিহাসের উৎপত্তি কীভাবে এবং কোন্‌দিকে তা প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যেক যুক্তিবোধসম্পন্ন ঐতিহাসিক একমত হবেন যে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন্‌টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে তা নির্ভর করবে যে পরিবেশে ঐতিহাসিক কাজ করেন তার ওপর। আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে পরিবর্তনকে মূলত ধারাপের দিকে পরিবর্তন বলে গণ্য করা হয় এবং তা ভয় জাগায়। এখানে অনুনুমিক দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণীয় কারণ তার জন্য তুলমাত্র কিছু সৌম সংস্কারের প্রয়োজন।

বর্তমানে ইতিহাস চর্চা

আজকের ইতিহাস গবেষণা সম্পর্কে কার মোটামুটিভাবে নঞর্থক মূল্যায়ন করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে 'সাধারণ ইতিহাসে'র প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এই ইতিহাস নিজের জোরেই দাঁড়িয়ে থাকবে এবং এর মধ্যে একত্র হবে আইনগত, সামরিক, জনসংখ্যাগত, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য শাখার ইতিহাস। তিনি মনে করেন বর্তমানের ইতিহাসকাররা ব্রত কারণ তাঁদের হাতে কোন তত্ত্ব নেই। প্রয়োজন হচ্ছে একটি বিমুখী আদানপ্রদান। অর্থনৈতিক, জনসংখ্যাতত্ত্ব, সামরিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ঐতিহাসিককে শিখতে হবে এবং তাঁরাও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করবেন। সমস্যাটা হচ্ছে ইতিহাসের তত্ত্ব প্রকৃতিগতভাবেই পরিবর্তনের তত্ত্ব আর একটি স্থগিত ঐতিহাসিকভাবে ভারসাম্যসমন্বিত পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজ অপ্রধান বা বিশেষ পরিবর্তন চায় অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কার আবার মনে করিয়ে দেন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আর যে সমাজ বর্তমানে দিশাহারা ও ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসহীন সেখানে অতীতের ইতিহাস নিঃসম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার অর্থহীন জলাধিচুড়ি বলে মনে হবে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর উপদেশ যে গ্রহণীয় হবে সেরকম কোন আশা তাঁর ছিল না।

শিল্প সাহিত্য ও ইতিহাস

দ্বিতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে কার-এর ইচ্ছা ছিল যে বর্তমানের সমাজ ও মননগত সংকটের বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসচর্চার সংকটকে বিচার করবেন। ফলে তাঁর লেখাপত্র থেকে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার কিছু প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তাঁর যে বক্তব্য তা হলো সাহিত্য ও সাহিত্য-সংক্রান্ত সমালোচনা ইতিহাস, প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের মতোই সামাজিক পরিবেশের দ্বারাই প্রভাবিত হয় ও তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে। 'ইনট্রোডাকশান টু পলিটিক্যাল ইকনমি'তে মার্কস বলেছিলেন, "এটি সুপরিচিত যে শিল্পের কিছু কিছু সার্থকতম সৃষ্টি সমাজের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে কোনমতেই

সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। ফলে তার বস্তুগত গঠনের সঙ্গেও তাদের মিল থাকে না, যেমন কোন সংগঠনের সঙ্গে তার স্থূলতম রূপের সম্পর্ক।"

কার-এর মূল্যায়নে মার্কস-এর এই পর্যবেক্ষণ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এই শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হতাশা, উদ্যমহীনতা ও অসহায়তা। এ. ই. হাউসম্যান বলেছিলেন, তাঁর প্রায় সব কবিতাই অসুস্থ অবস্থায় লেখা আর টি. এস এলিয়ট এই বক্তব্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে কার-এর মন্তব্য, দুজনেই 'অসুস্থ' কবিতা লিখেছেন আর কেউই বিদ্রোহী নন। শেক্সপীয়র-এর সনেট যখন এপ্রিলকে অভিনন্দন জানায় তখন এলিয়ট-এর 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' লণ্ডন সেতু অতিক্রমরত শ্রমিক জনতাকে মৃত জনতা বলে মনে করে। ব্যর্থতার প্রবক্তা কাফ্কা মানুষের মধ্যে কোন আশা খুঁজে পান না। কার-এর কথায়, এমনকি অরওয়েল-ও মানবজাতির প্রতি, বিশেষ করে নীচুতলার মানুষের প্রতি হতাশা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এটি এক ধরনের অন্ধবাদ। হেরমান হেসে-র প্রসঙ্গে কার বলেন, "তিনি পৃথিবী ছেড়ে আসা এক স্ব-সংবেদনবাদী (সলিপসিস্ট্) উদ্ভাবন, যার ঐ পৃথিবীতে আদৌ কোন বিশ্বাস নেই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে, তাঁর মতে, ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের দশক অবধি আঙ্গিক-বাদীরা আর ষাট থেকে সত্তর দশক অবধি গঠনমূলবাদীরা সাহিত্যকে ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি বিশুদ্ধ 'সত্তা' হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চান। এই সত্তা অন্য কোন বাস্তবের মাধ্যমে কলুষিত নয়। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা সর্বতোভাবে সাহিত্যের মধ্যেই দৃঢ়মূল হতে পারে না। কেননা সমালোচক নিজেই সাহিত্যের বাইরে থাকেন ও নিজের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আসেন। আর নীতিজ্ঞা বা রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের কোন প্রয়োগ নেই এবং ইতিহাস সম্পর্কে তা মনোযোগ দেয় না। এমন কি শব্দের যে অর্থ পরিবর্তন হয় সেই ধারণাও এখানে অনুপস্থিত।

ইতিহাসে প্রগতির ধারা

বর্তমানে প্রচলিত নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণে মানুষের অতীত যে প্রধানত প্রগতির ধারাবাহিকতা—এই ধারণাই কার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর সঙ্গে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা প্রকাশ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

এইজন্য তিনি প্রগতির তিনটি মূল নির্ধারণ করেন: পৃথিবীর বিস্তার, যার শুরু ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে; অর্থ নৈতিক বিকাশ, যা শুরু হয় সম্ভবত ষোল শতকে এবং জ্ঞানের বিস্তার, যেটি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এক প্রজন্মের অর্জিত জ্ঞানভার পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তারলাভের উপরই প্রগতি নির্ভরশীল এবং এইভাবেই তার উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য বিক্ষিপ্ত লেখাপত্র থেকে দেখা যায়, এই বিষয়ে চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আরো প্রমাণ উপস্থিত করার পরিকল্পনা কার-এর ছিল।

ইতিহাসকে প্রগতিরূপে বিশ্বাস করার ধারণাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঐতিহাসিকদের কাছে ক্রমেই বর্জিত হতে থাকে। আর এর বিপরীত মতে দৃঢ়বিশ্বাসী কার মনে করতেন আমাদের অতীত সম্পর্কে ধারণা থেকেই আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করি। কিন্তু তিনি এর সঙ্গে যোগ করেন যে এর উল্টোটাও প্রায় একইভাবে সত্যি। আর্নল্ড ব্লক তাঁর একটি বইয়ের শেষে বলেছিলেন, "প্রকৃত উৎপত্তি প্রারম্ভে হয় না, হয় অন্তিমে।"

ঐতিহাসিকের দায়িত্ব

এই সন্দেহ ও নৈরাশ্যের মূলে ঐতিহাসিকরূপে কার দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। তা হলো তাঁর নিজের জন্য বর্তমানের প্রণিধান এবং ভবিষ্যতের মননদৃষ্টিকে পরীক্ষা করা ও নির্দিষ্ট করে নেওয়া।

একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজৈবনিক স্মৃতিতে তিনি বলেন, "আজ পৃথিবী বোধহয় নৈতিবাদী ও কল্পরাজ্যবাদী (ইউটোপিয়ান) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রথমোক্তরা কোন কিছুতেই অর্থ খুঁজে পায় না, আর দ্বিতীয়রা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন অসাধারণ সুন্দর কিন্তু অনির্দেশ অনুমানের ভিত্তিতে অর্থ খুঁজে পায়। আমি দ্বিতীয়দের পক্ষপাতী। কারণ কল্পরাজ্যই ব্যক্তিকে সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে আর প্রকৃত কল্পরাজ্যের সঙ্গে অলস ও উদ্দেশ্যহীন আশাবাদের পার্থক্য আছে।"

বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের মূল্যায়ন

অনেক আগে, ১৯৩১-এই মার্কস-কে তিনি সবচেয়ে বেশী সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভা ও অন্যতম সকল ভবিষ্যদ্রষ্টা রূপে গণ্য করতেন। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় মার্কস ও মার্কসবাদের সমগ্র বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হ্যারল্ড লাস্কি-এর সঙ্গে একমত হন যে আজ পশ্চিমের সর্বহারা, অর্থাৎ শিল্প সংগঠিত শ্রমিকেরা—মার্কস-এর অর্থ গ্রহণ করলে—মোটেই বিপ্লবী নয়, এমনকি তার পরিবর্তে বোধহয় এক প্রতিবিপ্লবী শক্তি। কিন্তু এর ফলে তিনি নৈরাজ্যবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। বর্তমান পশ্চিমী সমাজে ক্ষয় ও পতন ছাড়া আর কোন সম্ভাবনা দেখা না গেলেও তাঁর বিশ্বাস এই উপরিতলের নীচে নতুন নতুন শক্তি ও আন্দোলন দানা বাঁধছে যাদের চরিত্র সম্পর্কে আমরা এখনো অনুমান করতে পারি না। এটিকে তিনি তাঁর অনির্দেশ কল্পরাজ্যবাদ রূপে চিহ্নিত করেন। কিন্তু কয়েকটি কল্পরাজ্যবাদী বাক্যবন্ধ ছাড়া মার্কস তাঁর সমাজতন্ত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেননি এবং ঐ একইভাবে কার-ও তা ব্যাখ্যা করতে অপারগ বলে জানিয়ে দেন।

কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশ ও ক্ষয়ের মূল্যায়ন তাহলে কীভাবে করা হবে? আর নতুন নতুন শক্তি বা আন্দোলন বলতেই বা কী বোঝায়? 'মার্কসবাদ ও ইতিহাস' নামে কার-এর একটি বলড়া লেখায় এই বিষয়ে কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই লেখাটি প্রকাশের আগে নিশ্চয়ই কয়েকবার সংশোধন করা হতো। কিন্তু তবুও এর থেকে ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়।

কার-এর মতে, গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীকে আর আগের মতো চেনা যায় না। পশ্চিমী সভ্যতার প্রাক্তন উপনিবেশসমূহের অনেকেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আর মেক্সিকো ও কিউবা বিপ্লবপন্থী। অন্যান্য দেশেও অর্থনৈতিক বিকাশ পূর্ণতর স্বাধীনতার পথ নির্দেশ করছে। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হলো রাশিয়া ও চীনের বৈপ্লবিক উত্থান। এইসব পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তার পরিণাম এখনো ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু এই ধরনের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব থেকেই নতুন সমাজ সংক্রান্ত সামাজিক দৃষ্টির জন্ম হয়েছে।

রাশিয়া, চীন ও পরে কিউবার বিপ্লব যে মার্কসীয় মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়। ফলত উনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের বিকল্প রূপ হিসেবে নতুন সমাজের সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যে মার্কস-এর কাছ থেকেই আসবে তা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজ প্রসঙ্গে মার্কস খুবই অল্প লিখে গেছেন এবং সেইসব লেখার প্রকৃতি প্রায়ই কল্পরাজ্যবাদী। ফলে এই বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ও অটিলতা আছে। কিন্তু মার্কস-এর বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনস্বীকার্য এবং আগামী দিনের সমাজ বিষয়ক যে কোন ধরনের অনুমানেই মার্কসীয় ধ্যানধারণা প্রচুর পরিমাণে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য।

বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছিলেন এই সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের বিকাশ অবরুদ্ধ হতে বাধ্য। ফলে বুর্জোয়া পুঁজিবাদীর পরিবর্তে শ্রমিকদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সমাজব্যবস্থা তৈরি হবে।

আজকের পৃথিবীতে জনগণের বৃহৎ অংশই আধুনিক সভ্যতার প্রাথমিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই পরিস্থিতিতে নতুন সমাজ সংক্রান্ত লোকায়ত দৃষ্টিতে মার্কসীয় মতবাদ যে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এও স্বাভাবিক যে পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত দেশে মার্কসবাদের আবেদন সবচেয়ে জোরালো; কারণ উন্নত দেশের মানুষেরা বুর্জোয়া পুঁজিবাদের বিরাট বিরাট কৃতিত্বের সুফল ভোগ করেছে এবং তাদের কাছে এই ব্যবস্থার ক্ষমতা যে নিঃশেষ হয়ে গেছে এইরকম ভাবা কঠিন। মার্কস কিন্তু ঠিক এইভাবে আশা করেননি। পরিত্যক্ত বুর্জোয়া পুঁজিবাদী বিপ্লবকে অতিক্রম করে অর্থনীতির শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ এবং সেই সঙ্গে উৎপন্নের উপর সমাজ ও পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণ উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধি করবে—এই হলো ভবিষ্যৎ সমাজের দৃষ্টি। আর এই বোধই পশ্চিমী ইউরোপীয় জাতির বাইরে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী।

এইসঙ্গে কার যোগ করেন যে এই দৃষ্টির বিভিন্ন রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু অস্বচ্ছ ও অনায়ত্ত। মার্কসবাদ এই ব্যাপারে সাহায্য করে না।

তাহলেও কার মনে করেন, বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হলো বলশেভিক বিপ্লব—এই প্রকল্পটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। আর সাম্রাজ্যবাদের আড়ালে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের মানুষের বিদ্রোহ পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পতনের কাজটি সম্পূর্ণ করবে। তার পরেই কার-এর 'অনির্দেশ্য কল্পরাজ্যবাদ'টি বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

"রোবট বিদ্রোহ" প্রসঙ্গে

প্রব্রাজ্যোতি মজুমদার

যেন কয়েক বছর আগে—কিশোর সমাজের জন্যে প্রকাশিত একটি জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার শারদসংখ্যায় একটা সচিত্র গল্প-কাহিনী ছাপা হয়েছিল। তার বিষয়বস্তু ছিল—রোবট উৎপাদনের "অগ্রগতি" এবং তার "সম্ভাব্য" ফলাফল। গল্পটা ছিল অনেকটা এরকম: সাইবারনেটিকসের তত্ত্ব এবং প্রয়োগের ক্রমোন্নতির মাধ্যমে শেষপর্যন্ত এমন এক ধরনের জটিল রোবট উৎপন্ন হলো, যারা মূলত যন্ত্র হলেও—ঠিক মানুষের মতোই চিন্তা-ভাবনা আবেগ অনুভূতির অধিকারী হয়ে উঠল। এবং, কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়াই—নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে—তারা নিজেদের অনুরূপ রোবট তৈরী করতে শিখে ফেলল। "স্বভাবতই" তারা চাইল—নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। ···মানুষেরা অবশ্যই পছন্দ করল না। সুতরাং সংঘাত বাধল—মানুষে আর রোবটে। পরিণামে গড়ে উঠল, যন্ত্রবিদ্বেষী এমন এক রোবট-সমাজ, যারা স্বাধীন হতে চাইল। মানব সভ্যতার দমন-পীড়ন থেকে রেহাই পাবার জন্যে, গোটাকয়েক বিরাট আকৃতির মহাকাশযান দখল করে নিয়ে, তারা একদিন পালিয়ে গেল মহাশূন্যে। অতি অগ্রগামী শিল্প সভ্যতার গুরুতর ক্ষতি হোলেও, মানুষেরা হয়তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বিজ্ঞানীরাও বোধ করি ভাবলেন—আপদ বিদায় হোল।·····

কিন্তু গল্পের গরু গাছে ওঠে! তাই দেখা গেল: ঐ সব কলাকুশলী রোবটের দল আশ্রয় নিল বহু দূরবর্তী আর এক "সৌরমণ্ডলে"র কোন একটি গ্রহে। সেখানে তারা গড়ে তুলল—বিশাল এক রোবট-সমাজ। কমপিউটার-বিজ্ঞানের অতি উন্নত কলাকৌশলের অধিকারী তো তারা ছিলই। উপরন্তু, বহু মানবের বিশেষ ধরনের সুযোগসুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের যন্ত্রসভ্যতার ক্ষেত্রেও 'মানবিক' সীমাকে ছাড়িয়ে গেল। তাদের বিজ্ঞানও হয়ে উঠল অনেক বেশী উন্নত। তার ফলে 'মহাকাশ বিজ্ঞান এবং 'ধ্বংসবিদ্যা'তেও তারা অতি মানবিক ক্ষমতা অর্জন করল·····।

কিন্তু "বংশ-পরম্পরায়"—মানুষের মতো অন্য জীবের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ তারা ভুলতে পারেনি। সুতরাং পৃথিবীর মানুষদের বিরুদ্ধে শুরু হোল একের পর এক অভিযান। শেষ পর্যন্ত মানুষেরা পরাস্ত হোল। তিন হাজার—কতো যেন এক খৃষ্টাব্দে—মানবজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেল। বুড়ি পৃথিবী মুখ থুবড়ে পড়ে রইল—ব্যর্থ মানব-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে·····!

॥ ২ ॥

বহুকাল ধরে এধরনের গল্প-টল্প আমরা সবাই পড়ে চলেছি—ইংরিজি এবং বাংলায়। ···স্মৃতি থেকে লিখছি। সুতরাং মিলেমিশে যেতেই পারে। কিছুটা রঙ চড়ানোর ব্যাপারও ঘটে থাকতে পারে। সেটা বড়ো কথা নয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে যেটা তুলে ধরতে চাইছি, সে প্রশ্ন মনে জেগেছে—এ ধরনের

কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী পড়ে কৈশোরিক চেতনায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। আমার নিজের এবং পরিচিত মহলের ছেলেমেয়েরা বলেছে: এই যদি কমপিউটার-বিজ্ঞানের এবং আনুষঙ্গিক সাইবারনেটিক গবেষণার সম্ভাব্য পরিণতি হয়, তা হলে তো মহাবিপদ। মানুষের সমাজ সত্যতাই যদি না বাঁচে এবং সুষ্ঠুভাবে বিকাশলাভ করতে না পারে—তবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অর্থ দিয়ে আখেরে লাভটা কী দাঁড়াবে?

সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দ্বিতীয় প্রশ্নটি অনেক বেশী ব্যাপক। এবং সেক্ষেত্রে 'হাইটেক্ সোসাইটি'র বহুবিধ সমস্যার কথাই চলে আসে। সেখানে প্রধানত, পারমাণবিক শক্তির বিকাশ এবং কমপিউটার-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অগ্রগতির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্নমুখী প্রশ্ন ওঠে। সেই ব্যাপক বিষয়ের আলোচনায় যাচ্ছি না এখন। আমরা এখানে শুধু 'রোবট বিদ্রোহে'র তথাকথিত সম্ভাবনার প্রশ্নেই কিছুটা বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। সেই বিশ্লেষণ মূলত সাইবারনেটিক্স্ নামক ব্যাপক এবং সংশ্লেষী বিজ্ঞানকেই অনুসরণ করবে।

সুতরাং প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভালো: সামগ্রিকভাবে সাইবারনেটিক্স্ এবং বিশেষকরে কমপিউটারবিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে রোবট নির্মাণ এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়া যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তার পরিণতি হিসেবে মানব জাতি ধ্বংস হবার ব্যাপারে কোনো প্রকৃত বিজ্ঞানী আশংকা প্রকাশ করেছেন বলে—আমাদের অন্তত জানা নেই। তবে গল্প অনেক দূর গড়িয়েছে; এবং বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা তার বিরুদ্ধে কলমও ধরেছেন। কার্ল কাপেক নামক যে সাহিত্যিক 'রোবট' শব্দটি চালু করেছিলেন, তিনিই "রোবট বিদ্রোহ" সংক্রান্ত কল্পকাহিনীর আদি স্রষ্টা[১]। তারপর থেকেই তাল পাল্লার গল্প বেড়ে চলেছে: আইজ্যাক রোবটের বেচালপনা থেকে আরম্ভ করে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ পর্যন্ত। আদি স্রষ্টা। উদ্দেশ্য যাই হোক, ইদানীং যেসব গপ্পো গজাচ্ছে সেগুলো পড়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে: এসব গপ্পো বানানোর পেছনে বিজ্ঞানসংস্কৃতির বারোটা বাজানোর সচেতন চক্রান্তও থাকতে পারে। সে ধরনের সংশয় আছে বলেই বিষয়টিকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি। তাই এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হবে: "কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তি" কি সত্যিই সম্ভব? অর্থাৎ—একটু ব্যাপক অর্থে—মানুষের বানানো যন্ত্র-দানব কি কখনোই মানুষের সবরকম মানসিক শক্তির অধিকারী হতে পারে? প্রশ্নটা যে এই ব্যাপক

---

১. লেখক মূলত স্লাভ এবং চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসী, চেক ভাষায় 'রোবোটা' মানে (বাধ্যতামূলক) শ্রম এবং পোলিশ প্রভৃতি স্লাভোনিক ভাষায় 'রোবটনিক' শব্দের অর্থ—শ্রমিক বা কর্মী। এই সূত্র ধরেই তিনি "যন্ত্রমানুষ" অর্থে "রোবট" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন—"রোসাম্স্ ইউনিভার্সাল রোবটস্" নামক নাটকে। নাটকের কাহিনী অনুসারে: রোবটেরা ধীরে ধীরে বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগ অনুভূতির অধিকারী হয়ে উঠল; এবং শেষকালে বিদ্রোহ করল। তারা শুধু তাদের মালিকদের বিরুদ্ধেই লড়াই করল না; যে সমস্ত বিজ্ঞানী এবং কলাকুশলী ব্যক্তি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদেরও খতম করল। শ্রীমতী মেরি শেলি রচিত "ফ্রাংকেনস্টাইন" উপন্যাসে—নিজের হাতে গড়া দৈত্যের হাতেও, অনেকটা এভাবেই, সর্বনাশ ঘটেছিল ডঃ ফ্রাংকেনস্টাইনের। উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু কাহিনীর মধ্যে কিছু আলংকারিক বক্তব্য আছে।

অর্থেই রাখছি তার পেছনে 'সাইবারনেটিক' যুক্তি রয়েছে। সেটা একটু বলি।

সামগ্রিকভাবে সাইবারনেটিক্স্ কমপিউটারবিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। জৈবিক এবং যান্ত্রিক, এই উভয় ক্ষেত্রেই যে কোন একটি সমগ্র ব্যবস্থা বা সিসটেমের মানসঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের (বা অঙ্গের) অন্তরঙ্গ পারস্পরিক সম্পর্কের যে কোন ব্যাপারই সাইবারনেটিকসের বিশ্লেষণ এবং গবেষণার প্রাসঙ্গিক[২]। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই—বিভিন্ন ধরনের 'নিয়ন্ত্রণ' এবং 'যোগাযোগ' সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব এ বিজ্ঞানের ওপরেই এসে পড়ে। স্বভাবতই, সাইবারনেটিক্স্ একটি সংশ্লেষী বা সিনথেটিক বিজ্ঞান : ভৌত-রাসায়নিক, শারীরবৃত্তীয়মনোবৈজ্ঞানিক, যুক্তিতত্ত্বীয়গাণিতিক এবং ভাষাবিজ্ঞানমূলক বিবিধ উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে এখানে। অর্থাৎ প্রকৃত দার্শনিক (মানে, সামগ্রিক এবং ব্যাপক) বিশ্লেষণ—জন্মসূত্রেই সাইবারনেটিক্সের দায়িত্ব (এবং অধিকার[৩])।

সুতরাং সাইবারনেটিক যুক্তি মূলত সমগ্রতাবাদী। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছি : প্রকৃত অর্থে মানবিক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন হতে গেলে, যন্ত্রমানবকে সংবেদন-প্রত্যক্ষণ-স্মৃতি-কল্পনার অনুষঙ্গে, আবেগ-অনুভূতি-সম্পন্ন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা পেতেই হবে। বস্তুত, এই ব্যাপক পটভূমির কথা বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ 'বুদ্ধি-বৃত্তি' কথাটার কোনো মানেই হয় না। সেই বিষয়টাই প্রথমে একটু বিশ্লেষণ করা দরকার।

॥ ৩ ॥

মানুষের মানসিক কার্যকলাপকে প্রথাগতভাবে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় : অবগতিমূলক, প্রক্ষোভগত ও চেষ্টা সংক্রান্ত[৪]। এদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি হল—অবগতিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড। সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতি সবই এই বিভাগের অন্তর্গত। সাধারণ ভাষায় বলা যায় : এইসব কাজকর্মের ফলেই আমরা পারিপার্শ্বিক জগৎ বিষয়ে জানতে পারি; আলাদা আলাদা

---

২. সেদিক থেকে 'সিসটেমস্ অ্যানালিসিস' নামক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সাদৃশ্য এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৩. বিংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবে"র পরিবেশে শিল্প-সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—ক্রমশ বেশি পরিমাণে—প্রত্যক্ষ মানবীয় নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে যান্ত্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হতে শুরু করেছিল। এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করল—রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক নীতিগুলো। সেইসব ব্যাপারের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ পর্যালোচনা করেই গণিত বিজ্ঞানী নরবের্ট ভীনার 1948 সালে "সাইবারনেটিক্স্" নামক গ্রন্থে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন [গ্রীক ভাষায় 'কাইবেরনান্' মানে হোল—'হালধরা' (to steer) এবং সমধাতুজ শব্দ "কাইবেরনিতিস্"-এর মানে দাঁড়াচ্ছে—মাঝি→ পরিচালক+নিয়ন্ত্রক (governor)]। ভাষাগত কারণেই ভীনার প্রবর্তিত পরিভাষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের "কনট্রোল সিসটেম"-এর রীতিনীতি বিশ্লেষণ সাইবারনেটিক্সের মূল কাজ।

৪. Cognitive, emotive and conative—functions.

করে বুঝতে পারি ; বস্তু এবং ঘটনা মনে রাখতে পারি ; অথবা তথ্যের ভাণ্ডার থেকে মালমশলা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করতে পারি ; আবার নানা ব্যাপার নিয়ে ভাবনাচিন্তাও করতে পারি।

বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোকেও যান্ত্রিকভাবে এই বিভাগে ফেলা যায়। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে—পরিবেশের সঙ্গে ঘাত খাইয়ে নেবার নানারকম সক্রিয় ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সেদিক থেকে—মনোযোগ, সচেতন ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি চেষ্টামূলক কার্যকলাপের সঙ্গেও তাদের নাড়ীর যোগ স্বীকার করতে হবে।

আসলে জৈব-সামাজিক বিকাশের ভিত্তিতে 'জ্ঞান' এবং 'কর্ম' অঙ্গাঙ্গিভাবেই সম্পৃক্ত। সুতরাং দেহ মনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যাত্মবাদী দ্বৈততার[৫] কল্পনাকে আমরা বাতিল করে দেব। ঐতিহাসিক বিকাশের বাতাবরণে আমরা বলব—প্রাকৃত-সামাজিক পরিবেশে, নাড়ির বন্ধনে যুক্ত ক্রিয়াগত দ্বৈততার[৬] এক জটিল এবং গতিশীল সমন্বয়ের ধারা হিসেবেই সমগ্র দেহ-মানস অস্তিত্বকে বিচার করতে হবে। এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এই চলমান সমন্বয়েরই প্রকাশ।

মানুষ ব্যতীত, অন্যান্য উন্নততর প্রাণীদের মধ্যেও বুদ্ধির ক্রমোচ্চ প্রকাশ কিছু কিছু রয়েছে। সেজন্যেই, স্বভাবজ সাধারণ বুদ্ধির বর্ণনায় প্রাথমিকভাবে বলা যায় (সম্পূর্ণ) নতুন কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে কোনো প্রাণী যে ক্ষমতার সাহায্যে বিভিন্ন কর্মসম্ভাবনার মধ্যে থেকে যথাযোগ্য সমাধানটি (খুঁজে পেতে) বেছে নিতে পারে, (উন্নততর ক্ষেত্রে) সমস্যাবলীর সঠিক মীমাংসা করতে সক্ষম হয়—সেই ক্ষমতাই হোল বুদ্ধি।

কিন্তু, অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাণীগত সাধারণ বুদ্ধি ও পরিবর্তনশীল বাস্তব পরিবেশের মধ্যেকার জীবিত প্রাণীদেহের সমগ্র অভিযোজন-প্রক্রিয়ারই প্রকাশ, এবং এই প্রকাশ আবশ্যিকভাবেই জৈবিক ক্রমবিকাশের ওপর নির্ভরশীল। স্বভাবতই, বুদ্ধিসম্পর্কীয় বিকাশ এবং প্রকাশের ব্যাপারটিকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুটি 'বিপরীতে'র দিক থেকে বিচার করতে হবে : একটি হলো পর্বজনিক[৭] এবং অপরটি ব্যক্তি-জনিক[৮]।— সংক্ষেপে বলা যায় : বুদ্ধি ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে কোন প্রাণীর পর্ব-শ্রেণী-বর্গ-জাতি-প্রজাতি[৯] প্রভৃতির ধারাবাহিক অভিব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট প্রজাতির অন্তর্গত বিশিষ্ট[১০] একটি প্রাণীর বয়ঃক্রমের ভিত্তিতেও বুদ্ধিগত প্রকাশের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের প্রাণীরা সুনির্দিষ্ট সাহজিক বৃত্তিগুলোর, অর্থাৎ অর্থহীন পরাবর্ত শৃঙ্খলসমূহের ভিত্তিতেই তাদের অভিযোজন প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। সুতরাং 'বুদ্ধি করে কাজ করার' কোনো প্রশ্নই সেখানে আসে না। বস্তুত, বুদ্ধির প্রকাশ ঘটতে হলে—জৈবিক অভিব্যক্তির ভিত্তিতে বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে দুটো উপাদান থাকতেই হবে : প্রথমত, আগেকার অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসেবে কিছু তথ্য[১১] স্মৃতির

---

৫ Spiritualistic duality ৬. Functional duality

৭ Phylogenetic ৮ Ontogenetic

৯ Phylum – class—order—genus—species ১০. particular

১১ Information/data (< datum)

তাগাদে জমে ওঠা চাই। দ্বিতীয়ত, সেই তথ্যগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে[১২]—নোতুন (সমস্যামূলক) পরিস্থিতির উপযুক্ত গ্রহণ আচরণের একটা 'ছক' বানিয়ে নিয়ে (তবে) কাজে নামতে হবে। [মানুষের অগ্রগামী আচরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যাপারকেই আমরা কল্পনা বলে থাকি। এই কল্পনাশক্তির জোরেতেই বাস্তব অভিজ্ঞতার (বা উপাদানের) ভিত্তিতে, মানুষেরা—বুদ্ধিবল কাজের জন্যে আগাম পরিকল্পনা তৈরী করে; কিংবা কোনো ঘটনাশ্রেণীর কার্যকারণ বিষয়ে প্রাথমিক প্রকল্প গড়ে তোলে]।

উল্লিখিত দুটো উপাদানের ক্ষেত্রেই—যথেষ্ট কার্যকরী যোগাযোগ সম্পন্ন শুক্রযন্ত্রিকের অতি উন্নত ব্যবস্থা-গুলো[১৩] গড়ে উঠতেই হবে। যথার্থ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিব্যক্তিতে, বেশ কিছু উচ্চতর পর্যন্ত দেখা যায় : শুক্রযন্ত্রিক বন্ধনের সংযোগী কার্যকলাপের মাধ্যমে শর্তাধীন পরাবর্ত পৃথক গড়ে ওঠার ফলেই—জৈব প্রাণীরা সাহজিক ক্রিয়া বাদেও, ক্রমশ জটিল অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সক্ষম। কিন্তু সেই সব কাজও অনেকটাই গতানুগতিক এবং আরোপিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রাথমিক অর্থেও বুদ্ধিশক্তির প্রকাশ ঘটে না। এমনকি, নিম্ন এবং মধ্যস্তরের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আচরণও সাহজিক ক্রিয়া এবং অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়ার সমাহার মাত্র। তবে অভিব্যক্তির ধারায়—শুক্রযন্ত্রিকের বহিঃস্তর আকারে প্রকারে ক্রমশ বিস্তারিত হবার ফলে শর্তাধীন পরাবর্ত ক্রিয়ার প্রথম সংকেত স্তরের ব্যাপ্তি এবং গভীরতাও ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে। সেজন্যেই মোটামুটি মধ্যস্তরের স্তন্যপায়ীরা অনেক বেশী জটিল কাজে অভ্যস্ত হতে পারে। তাদের প্রাণীগত অন্তরে[১৪] বাস্তবের প্রতিফলনও অনেক বেশী বিনিশ্চায়ক,[১৫] ব্যাপক এবং বিশদ। কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছোলেও সার্থক বুদ্ধির প্রমাণ মেলে না। মস্তিষ্কোত্তর প্রাণীদের মধ্যে কেবলমাত্র যথেষ্ট উন্নত স্তরের স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই সার্থক প্রাণীবুদ্ধির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নরাকৃতি বানর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিশেষত শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে প্রাথমিক অর্থে বুদ্ধি শক্তির বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এবং সেসব ক্ষেত্রে শুক্রযন্ত্রিক-বহিঃস্তরের ললাট অঞ্চল যথেষ্ট বিকশিত। সেজন্যেই সমস্যামূলক নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে—পর্যবেক্ষণের ফলগুলোর সঙ্গে নিজস্ব অভিজ্ঞতার জমানো সম্পদ মিলিয়ে মিশিয়ে, উপযুক্ত সমাধান বের করে তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে।

কিন্তু এই প্রাণীগত বুদ্ধিও মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির নাগাল পায় না। কারণ মানবিক বিকাশের গতিপথে মানুষের মধ্যে সংকেতের সংকেত হিসেবে ক্রমবিস্তারিত এক দ্বিতীয় সংকেতস্তর গড়ে উঠেছে এবং সেই স্তরেই মানুষের বুদ্ধি বহলাংশেই ভাষাকেন্দ্রিক যুক্তিবুদ্ধি[১৬]। বস্তুত মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি[১৭] এবং যুক্তিবৃত্তি[১৮] নামক ব্যাপার দুটোর মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। সূক্ষ্ম এবং বিশদ বিনিশ্চয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই জটিল সংশ্লেষী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে—স্মৃতি, কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সমন্বয় ঘটে থাকে।

---

১২. data processing বা তথ্য সমাযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

১৩ control-system

১৪. animal psyche এর মধ্যে। এক্ষেত্রে consciousness বা চেতনা শব্দটি সচেতনভাবেই বর্জন করেছি। psyche শব্দটিও আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হয়নি। ১৫. discriminatory

১৬. intellect ১৭. Intelligence ১৮. Reason (Intellect)

তবে মানুষের এই বিচিত্র ক্ষমতার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে, 'শরীরের ভেতরকার ভূতুড়ে সত্তার তত্ত্ব'[১৯] মেনে নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জৈব-সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণই যথেষ্ট: একদিকে প্রাণীগত অভিব্যক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা—মানবিক শুরুমস্তিষ্কের বিশ্লেষণাত্মক সংশ্লেষণ ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছে অন্যান্য উচ্চস্তরের 'প্রতিফলন', তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য সমাবোজনের শক্তি। আরেকদিকে—জ্ঞান এবং কর্মের পরস্পর-প্রভাবী সঞ্চালনের ভেতর দিয়ে মানুষের হাতে এসেছে বস্তুগত এবং ভাষাগত হাতিয়ার। সেজন্যেই মানব মনের যৌক্তিক কর্মকে মূলত 'সংজ্ঞাপী নিয়ন্ত্রণ' (কগিটিভ কন্ট্রোল) হিসেবেই বিচার করতে হবে।

এই সংজ্ঞাপী নিয়ন্ত্রণ বস্তুতপক্ষেই যৌক্তিক বা লজিক্যাল। অর্থাৎ, অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার থেকেও—মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে যুক্তিময়ী চিন্তাশক্তির সম্পর্ক অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। এবং সেই চিন্তা মানবসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ভাষাধর্মী উপাদানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত। চিন্তা যত বেশী সুসংবদ্ধ হবে, ততো বেশী পরিমাণে ভাষার সুসংগঠিত ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেবে। সেই যৌক্তিক সংগঠন সাধারণ ভাষার মাধ্যমে গড়ে তোলা যেতে পারে; আবার যৌক্তিক-গাণিতিক সংকেত ব্যবস্থার সাহায্যে তাকে সংক্ষেপিত করাও হতে পারে।

কিন্তু যে কোনো ধরনের ভাষাতেই চিন্তাভাবনা' করা যাক কিংবা সেই চিন্তাকে প্রকাশ করা হোক—সবরকমের প্রকৃত চিন্তার মধ্যে মূলত তিনটি স্তর বা পর্যায় থাকতেই হবে: ধারণা[২০]ভিত্তিক প্রস্তাব গঠন[২১] অনুমান কেন্দ্রিক যুক্তিবাক্য নির্মাণ[২২] এবং অনুমান প্রক্রিয়া।[২৩] সাবা কথায় বলব, চিন্তা করতে হলে: ভাষাগতভাবে জাতিবাচক শব্দের সাহায্যে শ্রেণীধারণা উৎপাদন করতে হবে; সেই সব ধারণাকে সাজিয়ে বিবৃতিমূলক বাক্য[২৪] তৈরী করতে হবে; এবং এক বা একাধিক হেতুবাক্য[২৫] থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হবে।

মানবিক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে যা বলা গেল, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে—তার মধ্যে প্রধানত তিনটি ব্যাপার থাকতে হবে: পরিবেশ মূল্যায়নের ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ,[২৬] সিদ্ধান্ত নির্ভর সমাধান নির্ণয়,[২৭]

---

১৯. "ghost in the machine" theory (অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব / spiritualism)

২০. notions → conception : concept-formation ২১. Judgement → proposition

২২. Inferential process → Inference (argument) ২৩. assertive sentence

২৪. premise (es)

২৫. goal-formulation through environmental evaluation : বলাই বাহুল্য যে—এ ধরনের মূল্যায়ন করতে হলে দুটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া ঘটতে হবে: বিনিশ্চায়ক প্রত্যক্ষণ এবং স্মৃতিগত উপাদানের সঙ্গে তুলনা। মানুষের ক্ষেত্রে সমগ্র ব্যাপারটিকে afferent synthesis বা অন্তর্বাহী সংশ্লেষ বলা হয়।

২৬. (inferential) decision making

এবং নির্বাচিত কর্মপদ্ধতির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে প্রাকল্পিক ভবিষ্য নির্দেশ।[২৭] এবারে দেখা যাক : উল্লিখিত সংশ্লেষমূলক জটিল বৌদ্ধিক কর্ম কোনো যন্ত্রমানবের পক্ষে কখনো করা সম্ভব কিনা।

॥ ৩ ॥

তথাকথিত কৃত্রিম বুদ্ধি প্রশ্নে চিন্তার কথা টেনে নিয়ে এসে আমরা যে কোনো 'অন্যায়' করিনি তার প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে একটি বিষয় উল্লেখ করছি। সাইবারনেটিক সাহিত্যে (আলংকারিকভাবেই) "কৃত্রিম বুদ্ধির" ক্ষমতাবিশিষ্ট যন্ত্রগুলোকে 'থিংকিং মেশিন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এদের মধ্যে মোটামুটিভাবে দুটো মূল শ্রেণী রয়েছে একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। সাধারণ ভাষায় এদের আমরা 'নিম্নস্তরের যন্ত্র' এবং 'উচ্চস্তরের যন্ত্র' বলে অভিহিত করতে পারি। অবশ্য এই প্রসঙ্গে যাদের আমরা 'নিম্নস্তরের যন্ত্র' বলছি, কমপিউটার-সমাজে তারা যথেষ্টই কুলীন! কারণ 'ম্যাগনেটিক টেপ' প্রকৃতির সাহায্যে তাদের স্মৃতিভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ তথ্য সঞ্চয় করে রাখা যায়; এবং বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলোর অনুসন্ধানী পুনরুদ্ধারও[২৮] করা যায়। এদের মধ্যে যারা 'মুখুযো বাঁড়ুযো' তারা—মানুষের কলকাঠি নাড়ার ফলে পূর্বনির্ধারিত রীতিপদ্ধতি[২৯] অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা মালমশলা-গুলো সমন্বিত করে লক্ষ্যনির্ভর সমাধান তৈরী করতে পারে।

কিন্তু, রোবট বানাতে হলে আরো অগ্রগামী স্বয়ংক্রিয়[৩০] ক্ষমতা থাকা চাই। সুতরাং এক্ষেত্রে 'উচ্চস্তরের যন্ত্র' হিসেবে এমন ধরনের 'অটোমেটন' তৈরী করতে হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে—'নিজে থেকে' তথ্য সংগ্রহের সামর্থ্য। তথ্য সমাযোজনের শক্তি এবং বিশেষ ধরনের কর্মদক্ষতা। 'রোবট' নামধারী এইসব 'অটোমেটন' বস্তুগুলির অধিকারী : পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন তারা 'অনুভব' করতে পারে। যান্ত্রিকভাবে খানিকটা 'প্রত্যক্ষণ'ও তাদের হয়তো হয়, কারণ আগে থেকে জমানো তথ্যের সঙ্গে তাৎক্ষণিক 'সংবেদন-মূলক অনুভূতি'কে তারা 'সমন্বিত' করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে—মানুষের দেওয়া উদ্দেশ্যমুখী কর্মধারা[৩১] অনুসরণ করে—তারা বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করতে পারে। তথাকথিত সার্থক রোবট সুনির্দিষ্ট কাজকর্মও করে দেয়।

এই ধরনের উন্নত স্তরের অটোমেশান প্রক্রিয়ার 'অবয়বে' মোটামুটিভাবে চারটি উপাদান বা এলিমেন্ট থাকে : (১) প্রাথমিকভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—প্রাণীগত সংবেদন গ্রাহক বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুকার[৩২] হিসেবে ইলেকট্রনিক "মস্তিষ্কের" তথ্যসংগ্রাহক ব্যবস্থা[৩৩]। মাইক্রোফোন, ফোটো-ইলেকট্রনিক সেল সমাবেশ,

---

২৭ predictive hypothesis (hypothetic prediction) : বাস্তবক্ষেত্রে ২৫, ২৬ এবং ২৭ নং প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই ঘটে থাকে। এদের সময়ের কাজ চলার সময়েও প্রতিমুহূর্তে লক্ষ্য এবং ফলাফলের তুলনার মাধ্যমে monitoring বা 'সতর্কী-নিয়ন্ত্রণ' প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

২৮, retrieval ২৯. Algorithm (সুনির্দিষ্ট, অবরোহী যুক্তি-সোপান)

৩০. automation ৩১ goal-oriented program ৩২. simulation

৩৩ input-system

তাপমাত্রা-ব্যবস্থাপক[৩৪] প্রভৃতির সাহায্যে প্রাক্তিবেশিক পরিবর্তন "অনুভব" করার বিশদ বন্দোবস্তই এ ব্যাপারটিকে সম্ভব করেছে। (২) তথ্যসঞ্চয় এবং তথ্যসমাবেশনের বিধিব্যবস্থা এবং রীতিপদ্ধতি সংগৃহীত তথ্যগুলোকে কাজে লাগায়। (৩) মানুষের হাত-পায়ের অনুকরণে তৈরী করা যান্ত্রিক অঙ্গসমূহের সাহায্যে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসারে বিশেষ বিশেষ কাজ করার ক্ষমতাও এদের থাকে। আত্মাধীন মোটর এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি রোবটের "স্নায়ুযন্ত্রের" কর্মক্ষমতা জোগায়। (৪) সমস্ত কাজগুলো যাতে প্রোগ্রাম মাফিক চলে, সেজন্য সমস্ত অটোমেটিক ডিভাইসের মতো এদের মধ্যে একটা কন্ট্রোল-সিস্টেম নিয়ন্ত্রক-ব্যবস্থা দিয়ে দেওয়া হয়। ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে লক্ষ্যাভিমুখী সামঞ্জস্য বিধান করাই এর প্রধান কাজ। অন্তর্মুখী "ফিডব্যাক" প্রক্রিয়ার[৩৫] মাধ্যমে কাজের রিপোর্ট চলে আসে "হেড-কোয়ার্টারে" এবং তারই ভিত্তিতে চলে "মনিটারিং প্রক্রিয়া"র ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ।

* * *

এতক্ষণ সংক্ষেপে (এবং খানিকটা আনাড়ির মতো!) রোবট-জাতীয় যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সব কথা বললাম, তাতে মনে হতে পারে যে—আমরা যন্ত্রদানবের প্রশস্তি গাইছি। এবং অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে—এতোদূর উন্নতি যখন সম্ভব হয়েছে, তখন ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে রোবটদের স্বাধীন চিন্তার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেবার দরকার কি?…

এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। এবং তাঁদের বক্তব্য সামান্য যেটুকু বুঝেছি, তাতে এটুকুই বলতে পারি যে—মানুষের তৈরী যন্ত্র মানব-সমাজে নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটাতে পারে; কিন্তু কোনো যন্ত্রই মানুষকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। এমনকি কোনো প্রাণীর সাধারণ বুদ্ধির তুলনাতেও—যন্ত্র বুদ্ধি নিতান্তই যান্ত্রিক, অবশ্য তাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে "ইলেকট্রনিক ব্রেন্।" এমনকি, তথ্য-সমাবেশনের দ্রুততায় মানুষকেও হারিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার কৃতিত্ব মানুষেরই; যন্ত্রের নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

মানুষের যুক্তিবুদ্ধির যেটুকু বিবরণ দিয়েছি এবং তার পটভূমি বিশ্লেষণ করেছি, তাতে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট: (১) মানবিক বুদ্ধি আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়; তার পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ প্রাকৃত-সামাজিক বিকাশ—শ্রম-ভাষা-চিন্তার ভেতরকার নাড়ির বন্ধন। (২) সুতরাং কোনো মানুষের বৌদ্ধিক ক্রিয়াই নিছক ব্যক্তিগত কোনো শক্তির প্রকাশ নয়। (৩) মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার উদ্ভব এবং বিকাশগত স্বরূপের দিক থেকে—একটি সচল এবং সামাজিক প্রাণীর সামগ্রিক অভিযোজনের নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ। স্বভাবতই তার মধ্যে রয়েছে দুটি বিপরীত প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব, একদিকে আছে শ্রেণীকরণের আপেক্ষিক যান্ত্রিকতার ভিত্তিতে, বিমূর্ত 'বিচ্ছিন্নতা'র ছকেবাঁধা অবরোহী শৃঙ্খলা।[৩৬] আরেকদিকে আছে প্রাকৃত-

---

৩৪. thermostat ৩৫. feed-back afferentation (?)

৩৬ stereotyped algorithm of abstract and discrete disjunctions

সামাজিক জ্ঞান-সংযোজনের প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করার উপযোগী নিরবচ্ছিন্ন তথ্য-সংশ্লেষ[৩৭] এবং উদ্ভাবনী সমাধান। অর্থাৎ, মানবিক চিন্তার যান্ত্রিকতার সবরকমের আরোহী, অবরোহী এবং উপমানাত্মক অনুমান সমাবিষ্ট হয়ে থাকে।

যান্ত্রিক সংগঠনের সীমাবদ্ধতার কারণে—তথাকথিত 'চিন্তাকারী যন্ত্র' কখনোই নিরবচ্ছিন্ন তথ্যসংশ্লেষের মাধ্যমে নতুন কোনো তত্ত্ব বা কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারবে না। অর্থাৎ, মানুষের সৃজনশীলতার অধিকার সে কখনোই হবে না। এই অসদ্ভাব্যতা শুধু অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়; মেশিনের সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতাই[৩৮] বস্তুবুদ্ধির সীমা নির্দেশ করছে, এবং করতেই থাকবে। প্রাণীদেহের আবয়বিক অবিচ্ছিন্নতা[৩৯] এবং জীবন্ত আন্তঃসম্পর্ক[৪০] যান্ত্রিকভাবে কখনই গড়ে তোলা যাবে না।

সুতরাং, 'রোবট কোনদিন স্বাধীন হতে পারে কিনা'—এ প্রশ্নই আসলে অবান্তর। তবে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ, কল্পবিজ্ঞানের মায়াজাল হয়তো বিজ্ঞানীদের কোনো ভাবপ্রবণ অংশকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তাই বিশ্লেষণমূলক আলোচনা নিশ্চয়ই অপ্রাসংগিক নয়। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাসংগিক আলোচনা হলো—"ম্যান মেশিন সিসটেম" : অর্থাৎ মানুষেরা কিভাবে কমপিউটার-বিজ্ঞানকে সৃষ্টিকভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের চিন্তার পরিধি আর গভীরতা এবং কর্মের দ্রুততা আর নিশ্চয়তার গণ্ডী উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতে পারবে। সেদিক থেকেই বলছি—সাইবারনেটিক দৃষ্টিভঙ্গীমূলক সমাজপ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে।

---

৩৭. non-disjunctive (and dialectical) synthesis of information—এই ভাবে আমরা পূর্বোক্ত তথ্য সমাবেশনের সঙ্গে এই তথ্য সংশ্লেষের পার্থক্য দেখাতে চাইছি। এতো সংক্ষেপে দেখানো গেল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

৩৮. organizational discreteness. ৩৯. structural non-discreteness.

৪০. living inter-relation.

নিম্নলিখিত বইগুলি থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি :

1. A. N. Leontyev, Problems of the development of the mind, Progress, Moscow, 1981.
2. Cybernetics within Us, Moscow.
3. I. M. Makarov (ed), Cybernetics of living matter, Mir pub, Moscow 1987.
4. ঐ, Cybernetics today, Mir pub, Moscow 1984
5. L. Gutenmacher, Thinking machines, FLPH Moscow (তারিখ নেই)
6. Encyclopedia Britanica—Automation, control system, cybernetics information theory.

গান্ধী ও বিজ্ঞান

প্রসেনজিৎ চৌধুরী

গান্ধীর মতো স্বনামধন্য ও বহুজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির চিন্তাধারা নির্মোহ-নিরপেক্ষভাবে বিচার করা সহজ নয়; কেননা, একাধিক কারণে গান্ধীর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা প্রবল এবং গভীর। এমনকি অনেকের বিচারে গান্ধী অবতার-প্রায় মর্যাদার অধিকারী। এমন অবস্থায় গান্ধীর চিন্তাধারার দোষ-দুর্বলতা তথা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথানিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে অধিকাংশ লেখক অক্ষম বা অপারগ হওয়ার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। এরা সাধারণত গান্ধী-চিন্তার যে দিকগুলোর সাথে আধুনিক ভাবধারা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো সামঞ্জস্য নেই, তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন না। আধুনিক মনোভাবাপন্ন জনসমাজে যাতে গান্ধীর ভাবমূর্তি নষ্ট না হয় তার প্রতি এই লেখকবৃন্দ খুবই সতর্ক ও সচেতন। বহুলাংশে নির্ভেজাল আবেগ এবং নিঃসর্ত আনুগত্য নিয়ে লেখা এঁদের রচনাসমূহ পড়লে বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রশংসা ও প্রশস্তির ঘন কুয়াশার আবরণ কিভাবে গান্ধী-চিন্তার প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

গান্ধী-চিন্তার যে কটি দিকের সঙ্গে আধুনিক ভাবধারার সম্পর্ক ক্ষীণ অথবা শূন্য তার ভেতর অন্যতম হলো পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি গান্ধীর নেতিবাচক মনোভাব। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে গান্ধীর পরিচয় ছিল যদিও তাঁর আদর্শ ও আচরণের ওপর সেই সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় না। এমনকি পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিপুল ও অবিশ্বাস্য অগ্রগতিও গান্ধীর চেতনায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর মতানুযায়ী আধুনিক সভ্যতা—যার একটি প্রধান অংগ আধুনিক বিজ্ঞান—এই সভ্যতার ঐতিহাসিক ভূমিকা বিধ্বংসকারী। তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানে এই সভ্যতার বিরুদ্ধে—বিশেষতঃ যন্ত্রোপকরণ ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে···নানাপ্রকার তিরস্কারমূলক মন্তব্য পাওয়া যায়। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই তিরস্কারমূলক মন্তব্যগুলোর ভিত্তিতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি গান্ধীর নেতিবাচক মনোভাবের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করব।

গান্ধীর সমাজ-দর্শন মূলতঃ অতীতমুখী। পুরনো গ্রাম-অর্থনীতির পুনরুত্থানের দ্বারা তিনি চেয়েছিলেন প্রাচীন সাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। (রোঁমা রঁলা, মহাত্মা গান্ধী, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৩) সমস্যা-জর্জরিত আধুনিক যুগের সামনে দাঁড়িয়ে গান্ধী যেন সমাজ-বিকাশের অতিক্রান্ত স্তর একটির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন সমস্যা-সমাধানের সহজ এবং নিরাপদ সূত্র। মনস্তাত্ত্বিকরা গান্ধীর এই অতীতমুখী সমাজ দর্শনের সঙ্গে regression নামক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারেন। কেননা, regression-এর সাহায্যে কিছু লোক সমস্যা, উদ্বেগ, ব্যর্থতা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করেন জীবনের অতিক্রান্ত স্তর একটির আচরণ অনুকরণ করে। (G. S. Blum, *Psychodynamics : The Science of Unconscious Mental Forces*. New Delhi, 1969, P. 40). সে যাই হোক,

একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে social regression বা সামাজিক প্রত্যাগমনের পক্ষপাতিত্ব করা গান্ধীর চিন্তা-চেতনায় আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ না থাকাটাই স্বাভাবিক। 'হিন্দ স্বরাজ' শীর্ষক রচনায় গান্ধী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বৃটিশ শাসকরা ভারতবর্ষ শাসন করছে তা নয়, আসলে শাসন করছে আধুনিক সভ্যতা। এই পীড়নমূলক সভ্যতার ভেতর গান্ধী রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং নানা প্রকার আবিষ্কার তথা কলাকৌশলকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব অবদান-সমূহের বর্জনের মধ্যে গান্ধী দেখতে পেয়েছেন ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা :

> India's salvation consists in unlearning what she has learnt during the past fifty years or so. The railways, telegraph hospitals, lawyers, [এঁদের সঙ্গে অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই এবং এঁদের বৃত্তিগত ভূমিকার নৈতিক চরিত্র ও প্রভাব বিতর্কাতীত নয়], doctors and such like have all to go, (বিনয় ঘোষ, **অটোমেটিক জীবন ও সমাজ**, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ৫৯, মন্তব্য বর্তমান লেখকের দ্বারা সংযোজিত)।

গান্ধীর এই দৃঢ় ও স্পষ্ট উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিবাচক, কল্যাণকামী ও গঠনমূলক ভূমিকার ওপর তাঁর বিশেষ কোনো আস্থা ছিল না। একথা অনস্বীকার্য যে ঔপনিবেশিক ভারতে বৃটিশ শাসকরা শোষণ-শাসনের সুবিধের জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধী ভেবেছিলেন, এই পীড়নমূলক ভূমিকাই বিজ্ঞানের একমাত্র ও অপরিবর্তনীয় ভূমিকা। বিজ্ঞানের ভূমিকা যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তথা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই সত্য গান্ধীর চিন্তায় অনুপস্থিত। সমাজ-তান্ত্রিক অন্তর্দৃষ্টির অভাবের দরুণ গান্ধী বিজ্ঞানের অপব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানকেই দায়ী করেছিলেন।

গান্ধী ছিলেন যন্ত্রের বিরুদ্ধে। তিনি ভেবেছিলেন, পুরনো গ্রাম্য-অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে যন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারলে নিষ্পেষণ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাবে মানব-সমাজ। এই জন্য গান্ধী অর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন : 'যন্ত্রের বিরোধিতে আমি আদৌ দুঃখিত হইব না।' (রোমা রঁলা, মহাত্মা গান্ধী পৃঃ ৩৫) গান্ধীর যন্ত্র-বিরোধিতা এতই তীব্র ছিল যে ভারতে মিলের সংখ্যা বাড়ানোর পরিবর্তে ইংলণ্ডের পণ্য কিনে মাঞ্চেস্টারে টাকা পাঠানোকে তিনি অনেক মঙ্গলজনক বলে মনে করতেন। কেননা, তাঁর মতে, 'যন্ত্র মানুষকে ক্রীতদাসের অবস্থিতে পরিণত করে।' (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০) বলা বাহুল্য যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে ক্ষেত্রবিশেষে যন্ত্রের যে নেতিবাচক ভূমিকা দেখা যায় তার ওপর গান্ধী অত্যধিক বা একমাত্র গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন মতামত ভালভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উৎপাদন সম্পর্কের দোষ-ত্রুটির জন্য তিনি উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতিকেই দায়ী করেছিলেন। উৎপাদন সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে সমাজকে শোষণমুক্ত করার স্বপ্ন দেখলে গান্ধীর মতো অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

চরকার ওপর গান্ধীর ছিল অপরিসীম এবং অবিশ্বাস্য আস্থা। একবার একজন আমেরিকানকে তিনি অভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন : 'I have not the slightest doubt that the saving of India and of the world lies in the wheel.' (M. K. Gandhi, *Non-Violence in Peace and War*, Vol. II, Ahmedabad, 1960. p. 95) একদিক দিয়ে দেখতে গেলে গান্ধীর এই প্রকার

উক্তি সত্যিই হাস্যকর। তবে এর নেপথ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা বিদ্যমান তাও সমানেই বিস্ময়কর। মজার কথা এই যে, চরকার গুণকীর্তন করার সময় গান্ধী বোধহয় লক্ষ্য করেননি যে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ইতিহাসে চরকাও একপ্রকার যন্ত্র হিসেবেই স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, বার্নালের মতো পণ্ডিত এমন আভাসও দিয়েছেন যে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে এই চরকাজাতীয় যন্ত্রের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী (J. D. Bernal, *Science in History*, Vol : I, Cambridge 1986, 96)। গান্ধী কিন্তু—ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য শুধু তাত্ত্বিক স্তরেই প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের এই বিকাশকে অগ্রাহ্য করেছিলেন।

নূতন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যদিও গান্ধী কখনও উদ্যোগীকরণের পক্ষপাতিত্ব করেননি। পাশ্চাত্যের ঔদ্যোগিক অগ্রগতি তার মনে কোনো আশার সঞ্চার করতে পারেনি। আমরা জানি, গান্ধীর স্বদেশপ্রীতি ছিল খুবই তীব্র এবং অভিজ্ঞতা ও / বা বিশ্লেষণলব্ধ সিদ্ধান্তের সাহায্যে মৌলিক শিক্ষা নেওয়ার অভ্যাস তাঁর ছিল কম। তিনি হয়ত কাল-বিরুদ্ধ বলে জেনেও—পুরনো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন অহরহ। এছাড়া, অনুন্নত ও শোষিত ঔপনিবেশিক সমাজের সংবেদনশীল সন্তা হওয়ার দরুণ গান্ধীর মনে নিশ্চয় আধুনিক ঔদ্যোগীকরণের প্রতি ছিল বিতৃষ্ণা-মিশ্রিত বিরাগ। গান্ধীর ঔদ্যোগীকরণ বিরোধিতার আলোচনা প্রসংগে এই কথাগুলো মনে রাখা উচিত বলে মনে হয়। এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রাসংগিক হবে যে গান্ধীর কতগুলো উক্তিতে যন্ত্রের প্রতি সহনশীলতা লক্ষ্য করা যায় (এস. এম ডাকর, **গান্ধীবাদের শ্রেণীরূপ**, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ: ৯; V. T. Patil (Ed), *Studies on Gandhi*. New Delhi, 1983, p. 88)। তবে এই সাময়িক সহনশীলতা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে তাঁর দৃষ্টিভংগীতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন এসেছিল। ১৯৪৬ সালেও তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : **'I do not believe that industrialisation is necessary in any case for country. It is much less so for India.** (M. K. Gandhi, *Non-Violence and Peace in War and Peace*, Vol : II, P. 115) অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞান এবং তার প্রয়োগের প্রতি গান্ধীর নেতিবাচক মনোভাব অটুট এবং অটল ছিল জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত।

যন্ত্রালোচিত এই নেতিবাচক মনোভাবের প্রকাশ গান্ধীর চিকিৎসা সম্পর্কীয় মতামতেও দেখা যায়। গান্ধীর ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল সুগভীর ও সুবিস্তৃত। এবং এই অটল ঈশ্বর-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠা নিয়ে গান্ধী বলতে পেরেছিলেন : **'No matter what the ailment from which a man may be suffering, recitation of Ramanama from the heart is the sure cure.'** (M. K. Gandhi, *Truth is God*, Ahmedabad, 1964, P 111). এই উক্তি গান্ধীর ভাববাদী ভাবধারার নির্ভেজাল দৃষ্টান্ত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কার্যকারণসূত্রের ভিত্তিতে রোগের চিকিৎসা করে। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর কিন্তু গান্ধীর অনাস্থা সুস্পষ্ট। তাঁর মতে আধুনিক ডাক্তার এবং অন্যান্য চিকিৎসকরা নিজের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে রামনামের অব্যর্থ ভূমিকার কথা অস্বীকার করেন (M. K. Gandhi, *Hindu Dharma*, Ahmedabad, 1958, p116). লক্ষণীয় যে ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু গান্ধীর চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়ার কথা পাওয়া যায়। আবার

আধুনিক বিজ্ঞান এবং তার প্রয়োগের বিরোধিতা করলেও গান্ধী তাঁর সদ্ব্যবহার করেছিলেন আজীবন, । রেলে চড়ে ভারতের চতুর্দিকে যেতেন এবং নিজের ভাবধারা প্রচারের জন্য আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করেননি কোনোদিন। এই জন্য আমরা বর্তমান নিবন্ধের একস্থানে এবম ইঙ্গিত দিয়েছি যে গান্ধীর বিজ্ঞান-বিরোধিতা ক্ষেত্রবিশেষে কেবল তাত্ত্বিক জোরই আরও ছিল।

একাধিক কারণে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি গান্ধীর মনে বিদ্বেষ ছিল। তাঁর মতে ডাক্তারেরা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে আঘাত করে, কারণ রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁরা যেসব ঔষধ যেন তার সঙ্গে মেশানো থাকে অল্প চর্বি বা সেরা জাতীয় জিনিষ (L.S.SO., Malloy, *Indian Caste Customs* Calcutta, 1976, p. 120)। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গান্ধীর আর একটি প্রধান আপত্তি হলো ব্যবচ্ছেদের আরম্ভ গ্রহণ। তাঁর মতে, 'মানুষের সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ এই ব্যবচ্ছেদ (বঁধা রোঁলা, মহাত্মা গান্ধী, পৃ: ৩২)। মৃতদেহকে কাটা-ছেড়া করার মতোও গান্ধী খুঁজে পেয়েছিলেন হিংসার আভাস। অথবা পরম্পরাগত বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি মৃতদেহকে অপবিত্র ভেবেছিলেন। ভারতে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসারের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কীয় পরম্পরা-জর্জরিত এই বিদ্বেষ ও আতংক উনিশ শতকে কি বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

ইসলীংডাঙ্গে চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার অবশ্যপ্রয়োজনীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। গান্ধী কিন্তু এই প্রকার বিজ্ঞানাশ্রিত অবশ্যপ্রয়োজনের সমর্থক ছিলেন না। তিনি বিদ্রূপ ও ঘৃণার ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে চিকিৎসালয়গুলো আসলে পাপ প্রসারের প্রতিষ্ঠান। 'Hospitals are institutions for propagating sin.' (R. P. Dutt, *India Today*, Calcutta, 1970, p. 625)। এই প্রসঙ্গে গান্ধী যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা বেশ চিত্তাকর্ষক। তাঁর মতে, আধুনিক ঔষধ-ব্যবস্থা রোগের যে মূল কারণ—অর্থাৎ, মানুষের কাম ও পাপ—তাকে দূর করতে চেষ্টা করে না। শুধু তাই নয়, গান্ধী অভিযোগ করেছেন যে পাপীর বিপদের আশংকা হ্রাস করে এইঔষধ-ব্যবস্থা আসলে পাপকেই প্রশ্রয় দেয় (বঁধা রোঁলা, মহাত্মা গান্ধী, পৃ: ৩১-৩২)। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি গান্ধীর বিদ্বেষ বিদ্রূপ এতই তীব্র ছিল যে তিনি এমনকি দেশীয় হাকুড়ে চিকিৎসাকেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চেয়ে ভাল বলে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেননি : 'Quackery is infinitely preferable to what passes for high medical skill, R. P. Dutt, *India Today*, P. 625)। বিজ্ঞান-বিরোধিতার এমন উগ্র ও অন্ধ দৃষ্টান্ত ঘোষহয় খুব সুলভ নয়।

গান্ধীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রচনার মধ্যে যুক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনি যেভাবে সমালোচনা করেছেন তার অনেক কিছু উপেক্ষণীয় নয়। কেননা, তাঁর চিন্তাধারার যে দার্শনিক দুর্বলতা এবং প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা তার এক অনস্বীকার্য দৃষ্টান্ত তাঁর এই প্রবল ও পরিষ্কার বিজ্ঞান-বিরোধিতা। এই বিরোধিতা সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে উগ্র ও অন্ধ না হলেও গান্ধী-চিন্তার এই তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটির উৎস, উদ্ভব এবং ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনুসন্ধেয়।

মনোবিদের ডায়েরী

রাজাবিদ

—"ডাক্তারবাবু, এক মিনিটের বেশি নেব না। একটা কথা শুধু একটা কথা, জিগ্যেস করেই চলে যাব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওঁদের বলে এসেছি। রিপোর্ট করেই ফিরে যাবো—"

বাধা দিয়ে বললাম—যাতে ভূমিকা ছেড়ে কাজের কথাটা বলে ফেল। তাড়াতাড়ি।

—বলছিলুম কি, আমি খুব বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখছি। রোজ রাতে। খুব খারাপ, খুব খারাপ।

—কি স্বপ্ন? বলো। আহা, দাঁড়িয়ে না থেকে বসো। বসো।

—না, ডাক্তারবাবু, আপনার সামনে সে কথা আমি বলতে পারছি না। না, না, পারলো না। — বিড়বিড় করতে করতে মেয়েটি যেমন দ্রুত ঘরে ঢুকেছিল, তার থেকেও দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।

অন্য রোগীদের নিয়ে দৈনন্দিন কাজে ডুবে গেলাম।

দিন সাতেক পরে আবার আবির্ভাব। এবার সঙ্গে এসেছে মাকে। মেয়েটির নাম কৃষ্ণা। কালো রঙ-এর উজ্জ্বল মুখশ্রী আজ ম্লান। বেশবাস অবিন্যস্ত, রুক্ষ কালো চুলগুলোর কয়েকগুচ্ছ কাঁধের ওপর নেমে এসেছে। খুবই আনমনা। রোগীর চেয়ারে বসে জানলার দিকে তাকালো।

মা-র মুখে সব সময়ে হাসির আভাস থাকে। অনেকদিন কোলকাতায় আছেন, তবুও কথা শুনলেই পূর্ববাংলার মানুষ বলে চেনা যায় তাঁকে। তিনি বললেন—জানেন ডাক্তারবাবু, আপনিতো সাধারণ মুদ্রারোগ দেখেন। তা বড়ন অনেক ধাইতে চলল। ভালই আছিল। আবার সেই ছোঁয়াছুঁয়ি ঘোঁয়াঘুঁয়ির বাতিক চাগাড়ে উঠছে। বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করার পর একটা যামন ত্যামন চাকরিও জোটাইতে পারছে। পরীক্ষার আগেতো আসছিলো আপনার কাছে; তখন বাসে ট্রামে কইরা কলেজে যাইতে পারতো না। চিকিচ্ছার পর একা কলেজে যেছে, পরীক্ষায় বইছে। আমাগোরে গলির মধ্যে দিয়ে দুই মিনিটের পথ যাইতে পাঁচবার ফিরে আইসা মুতা লাগতো, এখন বিশ মিনিটের বেশি লাগতো এই পথ পার হইতে। ওষুধ যান আপনার এইখানে চিকিচ্ছের পর ও একেবারে ভাল হইয়া গেল; যে বাথরুমে তিন ঘন্টার বেশি সময় কইরা থাকতো, সেই বাথরুমের কাজ দশ মিনিটে শেষ কইরা বাইরা যাইরা গলি বাইরা···

মায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়ে ছোট্ট একটু ধমক না দিলে মায়ের মুখ বন্ধ করতে আমাকেই মুখ খুলতে হতো। মা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—হুঁ, হুঁ, খেয়াল আছিলো নাঃ ডাক্তারবাবুরতো এই সব কথা জানাই আছে। আমি উইঠা ঐ ঘরে গিয়া বইতাছি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কৃষ্ণা তবুও মুখ খোলেনা দেখে বলতে হল—হ্যাঁ, এইবার তোমার কথা বলো। ঘোরোতো একজনের কথা শুনতে আমরা অনেকক্ষণ সময় দিতে পারি না।

কৃষ্ণা আমার সহকারী তরুণ ডাক্তারটির দিকে তাকিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করে বলল—উনি যদি দয়া করে মিনিট দশেক বাইরে যান তাহলে—

ইংগিত করতে ডাক্তার বাইরে গেল। অতি সন্তর্পনে দরজা বন্ধ করে এসে কৃষ্ণা নিজের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকজোক কাটতে কাটতে বলল—আমি যে কিছুতেই মুখ খুলতে পারছি না ডাক্তারবাবু। আমার লজ্জা করছে। ঘেন্না লাগছে, নিজেকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

—এবার কি নিয়ে, কিসের ভয়ে শুচিবায়ু বেড়ে উঠেছে? বলো। শত বছর প্রথম ছিল কলাগাছে হাত লাগবার ভয়, তারপর দেখা দিলো গলির রাস্তায় মলমূত্রের ঘেন্না, তারপর বাসে ট্রামে মরলা কাপড়পরা লোকেদের ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়, তারপর বোধ হয় ভটপন দিয়ে লেখার ভয়? আরো দু-চারটে ছিল। সব হয়তো তোমারও মনে নেই। কতবার বলেছি, তোমার ঘেন্নার, হাত পায়ে বার বার সাবান ঘষার পেছনে একটা অপরাধবোধ লুকিয়ে আছে। তুমি অস্বীকার করেছ। বলেছ, না আমার মনে পাপবোধ জাগে ভয়ে।

কলাগাছে এখন আমি হাত দিতে পারি, গলির মল ময়লা এড়িয়ে অনায়াসে বাসে ট্রামে উঠতে পারি। কিন্তু আমি একটা বিকট বীভৎস ভয়ে মরতে বসেছি। মাকেও বলিনি। আপনাকে বলতেই হবে। আর তা না হলে আমায় গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

হ্যাঁ বলো। আমি তোমার ঠাকুরদাদার বয়সী, আমি ডাক্তার। আমার কাছে সব খুলে বলো।

—আমার ভয় স্বপ্নকে। একটা স্বপ্ন আমি রোজই দেখছি। স্বপ্ন দেখে ভয়ে ঘামে ভিজে আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। সারারাত ভয়ে কুঁকড়ে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে বসে রাত কাটাচ্ছি।

—মেয়েটি মুখ নীচু করলো, চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

—একটু কঠোর স্বরে বলতে হল—ভনিতা করলে চলবে না। যা বলবার চটপট বল। আর বেশি সময় দিতে পারছি না—বাঁ হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

কৃষ্ণা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠলো—আমি রোজ রাতে স্বপ্ন দেখি আমাকে ধর্ষণ করছে। একটা ভীষণ মাস্কুলিন বলিষ্ঠ জোয়ান হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে আমাকে ধর্ষণ করছে।

চোখমুখে হাত চাপা দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো মেয়েটা।

সান্ত্বনার সুরে বললাম—স্বপ্ন দেখার মধ্যে তোমার দোষটা কোথায়? স্বপ্নে অসম্ভব অবাস্তব দৃশ্য অনেকেই দেখে থাকে, ভয়ও পেয়ে থাকে। কিন্তু স্বপ্ন তো শখ করে কেউ দেখে না। স্বপ্ন তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা করে না। ভয় পেতে পারো, কিন্তু পাপ করছো না। স্বপ্ন তুমি ইচ্ছে করে দেখছো না।

—কিন্তু সেই একটা লোককেই বারবার দেখছি কেন? খুশী কদাকার বলিষ্ঠ সেই মানুষটার সঙ্গে আমার আপিসের ভোজপুরি দারোয়ানটার কোথায় যেন একটা মিল আছে। আমার নতুন চাকরিতে ঢোকার মাস তিনেক পর থেকেই আমি স্বপ্ন দেখছি—আজ ১৫।২০ দিন আপিসে যেতে পারছি না। আপিসে না যাবার জন্যে বাবার গঞ্জনা, মায়ের তাড়না দিনরাত। না মরলে আমার নিস্তার নেই। বাবাদের তিনজন বেকার। আমার রোজগার না হলে—

—তাই বুঝি তুমি ন' মাসে ছ' মাসে একবার বেণী যাও, আর প্রেসক্রপশন রিপিট করে কেটে পড়। শোনো, তোমার মাকেও বলে দিচ্ছি, তোমাকে নিয়মিত আসতে হবে, নিয়মিত 'সাজেশান' নিতে হবে। ডাক্তারের খরচা লাগবে না। —সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা বেরিয়ে গেল।

দিন পনেরো পরে ক্যাসেট নিয়ে যার সঙ্গে আবার হাজির। এদিন দেখেই বুঝলাম সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ। হ্যাঁ, লিখতে ভুলে গেছি, আগের দিনে স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল মিনিট কুড়ি ধরে। স্বপ্ন মাত্রেই নির্জ্ঞান মনে অবদমিত বাসনার চরিতার্থতা—এই ভুল ধারণা তার মন থেকে দূর করাতে পেরেছিলাম বলে মনে হল। রুকা সহজ গলায় জানাল স্বপ্ন সে দেখছে, কিন্তু আগের মত ভয় পাচ্ছে না। পরে বোধহয় ওষুধের জন্য আবার ঘুমোতে পারছে। কিন্তু পাপবোধ থেকে নিস্তার পায়নি।

—তোমার নিজের কৈশোরের কথা সব ভেবে দেখেছ কি? বারো তেরো বছরে, তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছিলে; তোমার মনে অন্য মেয়েদের তুলনায় বোধহয় কিছু আগে থেকেই প্রথম রিপুর উপদ্রব শুরু হয়েছিল। না, না, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এই ইচ্ছা 'ইউনিভার্সাল', সব দেশের কিশোর-কিশোরীদের মনে এই চেতনা আসবেই। মধ্যবিত্ত ঘরের কিশোর-কিশোরীরা ভাবে শুধু বুঝি তার মনেই এই চিন্তা আসছে, আর কারুর মনে আসছে না। বিজ্ঞ লোক বা আমাদের মতো চিকিৎসকের কাছে এসে খোলাখুলি আলোচনা করলে পাপবোধ অপরাধবোধের তীব্রতা কমে। তার পর আধাঘুমন্ত অবস্থায় অভিভাবন চিকিৎসার ফলে পুরোপুরি বাস্তববুদ্ধি বিকশিত হয়। পাপের ভয় দূর হয়ে যায়। এইবার ১০।১২ বছর আগেকার কোনো ঘটনা, কোনো দুর্ভাবনা, এই সংক্রান্ত, কিছু মনে পড়ছে কি?

আবার ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ নীচু করে নিশ্চুপ থাকলো কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো অফিসের দারোয়ানটাকে অনেকটা আমার জেঠুর মত দেখতে। তাই, তাই—কি একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল। আবার সেই রকম মুখ নীচু করে—

—জেঠু মানে জ্যাঠামশাই, তোমার বাবার দাদা?

—বাবার বড় কাকার বড় ছেলে—মৃদু গলায় বললো রুকা। বড় একটা যৌথ পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম আমি। তিনি বিয়ে করেননি। কয়েক বছর আগে তিনি মারা গেছেন। বাড়ীর বড় কর্তাই ছিলেন তিনি। মস্তবড় কুস্তিগির, খুনের জন্য জেল খেটেছেন।

—তাঁর সঙ্গে তোমার অফিসের দারোয়ানের মিলটা টেনে আনছো কেন? আমিতো কোনো মিল বুঝতে পারছি না।

—দাড়ি, পালোয়ানের মত চেহারা, গোল বড় বড় চোখ—

—ও: বুঝেছি। আর কিছু বলতে হবে না।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রুকা। কিছুই তো বলিনি, কিছুই শোনেননি। এক রাত্রে বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন। আমার তখন, হ্যাঁ, আপনি যা বলেছিলেন সেই রকম। বারো কি তেরো। আমার শোবার ব্যবস্থা হল জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে তাঁর ঘরে। ···এইটুকু বলে সে আবার চোখ মুখ চেপে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো—এতদিন বলিনি, বলতে পারিনি। স্বপ্ন বলে মনে হতো, হয়তো আমার অসুস্থ মনের কল্পনা। বাস্তবে এমন ঘটতে পারেনা বলে ভাবতাম। তাই বলিনি। এখন মনে হচ্ছে ঘটেছে। যা ঘটেছিল তা সত্যি। কিন্তু না আর কিছু বলতে পারবোনা ডাক্তারবাবু—স্বপ্নটা সত্যি। স্বপ্ন নয়, সত্যি।

—না, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। সব আমি বুঝতে পেরেছি। মাকে ডাকো। ক্যাসেটটা আমার হাতে দাও।

যৌথ পরিবারে এই রকম দুর্ঘটনা—ইনসেস্ট যানে, অজাচার সম্পর্কিত দুর্ঘটনার কথা ডাক্তাররা শুধু নয়, পাঠকরাও দু-একটা জানেন নিশ্চয়ই। সংখ্যায় নগণ্য। সব ঘটনায় ফলে কৃষ্ণার মত শুচিবায়ু রোগে সকলে ভোগে না। অনেকের মনে সাময়িক ভয়ের বা ঘৃণার সঞ্চার হলেও, পরবর্তী জীবনে অনেক কিছু পুরনো অপ্রিয় স্মৃতির মত অজ্ঞাত উজ্জ্বল সুন্দর ঘটনার চাপে স্মৃতির গলিতে তলিয়ে যায়। কারো কারো মনে থাকলেও, সাম্প্রতিক প্রকোভ তাড়না সইতে হয় না। নিজের স্বপক্ষে নির্দোষের বেশ কিছু অজুহাত তৈরী করে নিতে পারে; আবার কিছু মানুষ—এই রকমই ঘটে থাকে বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

সব ক্ষেত্রেই কৃষ্ণার মত রোগ-উপসর্গ দেখা যেবে—এমন কোন কথা নেই। এখনই একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে, যে কৃষ্ণার মত অবিবাহিত নয়। ১৪।১৫ বছরের বড় কাকা তার রোগের কারণ। বিয়ের পর বিচ্ছিন্নতা ও যৌনশীতলতার জন্য তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। কৃষ্ণার মত তার পাপবোধ বিভিন্ন আকারে ব্যক্ত হয়নি; কৈশোর ইতিহাস তার মনে পড়েছিল দ্বিতীয় কি তৃতীয় সেশনেই। সরাসরি প্রশ্ন করার পর যৌন ম্লান মুখে তার দুর্ঘটনার কাহিনী অশ্রুকোচে বিবৃত করতে একটুও আটকায়নি। কোনো সময়েই তার পাপের গ্লানি সম্পর্কে কোনো অস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কৃষ্ণার রোগ কেতাবী মতে 'অবসেশিভ কমপালসিভ নিউরোসিস' আর ব্রততীর রোগ ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস। প্রথমটার গুরুত্ব দ্বিতীয়ের থেকে কম; যদিও আমার মত অনামী চিকিৎসকের কাছে প্রথমটির চিকিৎসার (সাইকোথেরাপি) জটিলতা বেশি, সময়ও লাগে বেশি। কাজেই প্রথমটির গুরুত্ব দ্বিতীয়টির থেকে কম বলি কি করে?

এবার চিকিৎসার কথায় আসা যাক। চিকিৎসা বলতে শুধু ছাড়া মনের অসুখে আমরা যে সব কথাবার্তা, বিশ্লেষণ, সংবেদন, অধিভাবন ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকি সেই চিকিৎসার কথা বলছি।

পাপ কি? পাপ-এর নীতিগত দিক, অপরাধের দণ্ডাজ্ঞাভিত্তিক ধারণা ইত্যাদির আলোচনা আমাদের 'থেরাপি'তে বিশেষ প্রয়োজন। দেশকালভিত্তিক সামাজিক মূল্যবোধের আলোচনাও অপরিহার্য। কৃষ্ণার ও ব্রততীর পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব একই রকমের না হতে পারে। তার জন্যে যে আঘাত কৃষ্ণার ভয় দূর করবে, সেই ধরনের আঘাতে হয়তো ব্রততী আঘাত হবে না। প্রথম রিপু সহজাত প্রবৃত্তি, অতএব অসীম শক্তিশালী—এই কথা বলে পাপবোধ দূর করবার চেষ্টা রোগী ও সমাজের পক্ষে উপযোগী হবে না। প্রথম রিপুর সামাজিকীকরণ সম্ভব, এই সহজ সরল কথাটি নানা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে। পাশ্চাত্য দেশের 'ডেটিং' ইত্যাদি যেখানকার সমাজে চালু, কাজেই রিপুর সামাজিকীকরণের চেষ্টার প্রয়োজন বিশেষ নেই—এ ধরনের কথা দু এক ক্ষেত্রে বলার দরকার কখাচ হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতি মূল্যবোধ ইত্যাদি দেশকাল বিশেষে বিশিষ্ট—এই কথাটা সব সময়ে মনে করিয়ে দিতে হবে।

কৃষ্ণার চিকিৎসায় সময় বেশি লেগেছিল, তার কারণ শুধু ব্যক্তিকোষের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিক টাইপ দিয়ে ব্যাখ্যা করে চলবে না। কৃষ্ণার পারিবারিক পরিবেশের নেতিবাচক দিকগুলির কথা মনে রাখতে হবে। সে একদিকে পুরুষপ্রধান পরিবারে অনাদৃত ও হীনমন্য বলে চিহ্নিত; আবার উপার্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সমাজে তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। অবিবাহিত ২৫।২৬ বছরের তরুণীর পক্ষে বিশেষ করে তার মত মানসিক তাদাত্ম্যহীনতার জন্য, যে অঙ্কের তুলনায় বেশি দায়ভারগ্রস্ত ও ভীত। ব্রততীর

স্বামী স্ত্রীকে শুধু স্ত্রী বলে ভাবেন না, তাঁকে একজন ব্যক্তি বলে গণ্য করেন। চাকরীর জন্য বাইরে না বেরিয়েও সে কুকার থেকে অনেক বেশি স্বাধীন ও আত্মবিশ্বাসী। বিধবতার রোগী হলেও স্বামীর বলগ্রহ নয়।

মনের চিকিৎসায় এইসব নানাদিক বিচার করে অভিভাবনের সঠিক বয়ান তৈরী করা দরকার। যার মনের জোর কম, তাকে মনের জোর করতে পার না?— এই বলে অনুযোগ করে বাড়ীর লোক এবং কিছু অনভিজ্ঞ চিকিৎসক। এতে রোগীর হীনমন্যতা বাড়ে। চেষ্টা করেও কিছুই উন্নতি হচ্ছে না দেখে হিতাকাঙ্খীর নির্দেশ উৎসাহিত না করে রোগীকে নিরুৎসাহী করে তোলে। সব সময় এই ভাব সঞ্চার করার চেষ্টা করতে হবে, যার ফলে তার মনে হয় যে তার ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল সেটা তখনকার মত তার সহ্য করার শক্তি থেকে বেশি, তাই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এখন চিকিৎসার ফলে তার মনোবল সহনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি ঘটবে এবং চিকিৎসান্তে সে আর পাঁচজনের মত জীবনের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে পারবে, নিজের অধিকাংশ সমস্যার নিজেই সমাধান করতে পারবে; সমাধানসাধ্য সমস্যাগুলোকে আপাতত যতদূর সম্ভব নিজের মত চলতে দেওয়া হবে। 'ওয়েট, ওয়াচ এ্যাণ্ড সি'—পুরনো দিনের চিকিৎসকরা প্রায়ই এইকথাগুলো বলতেন। অবশ্য শারীরিক অসুখের বেলায়। অ্যান্টিবায়োটিক্স ও তার পরবর্তী আরো জীবনরক্ষী ঔষধের আবিষ্কার এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতির আগের যুগের কথা বলছি। ভাগ্য কি ভগবানে যাঁদের আস্থা আছে, তাঁদের মনোবল বাড়ানোর জন্য যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানানোকে হাসি ঠাট্টা করা ঠিক নয়। রোগীর ও আত্মীয়স্বজনের ইতিবাচক বিশ্বাস ও মনোবলে কিছু না কিছু উপকার সব রোগেই হয় বলে আমি বিশ্বাস করি।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেও বিপ্লব এসেছে, তার অনেক দিকে উন্নতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বাড়ার জন্য রোগের চিকিৎসাই হয়, রোগীর চিকিৎসা ঠিক হয় না। সেকালের চিকিৎসকদের কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা বেশি রোগীভিত্তিক ছিল। এখনকার চিকিৎসকের ক্ষমতা অনেক বেশি, তাঁরা যদি রোগীর সঙ্গে আত্মীয়তা (rapport) স্থাপন করেন তাহলে বোধহয় আরো বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

কিছুটা অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি মনে হচ্ছে। তার জন্যে মাপ চাইছি।

চাণক্যের সমীক্ষায় মানবমন

কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

পরিবেশ এবং সংসর্গের জন্য মানব মন অধম, মধ্যম ও উত্তম হওয়ার একটি পৌরাণিক চিত্র—

অসতাং সঙ্গদোষেণ সাধবো যান্তি বিক্রিয়াম্।
দুর্যোধন প্রসঙ্গেন ভীষ্মঃ সোহরণে গতঃ॥

অর্থাৎ যে ভীষ্মের চরিত্র অতুলনীয়, কিন্তু দুর্যোধনের মত ব্যক্তির খপ্পরে পড়ে অথবা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অসতের সঙ্গ করে বিরাট রাজার পক্ষ চুরির কাজে সাহায্য করেছিলেন। তাই বলতে হয় একই ব্যক্তি, একই মন কিন্তু সঙ্গদোষে, সঙ্গগুণে অধমও হয়, মধ্যমও হয়, উত্তমও হয়।

চাণক্য একটি লাক্ষণিক বিচার করেছেন, অর্থাৎ চিকিৎসক যেমন বিবেচনা বা অনুশীলন করে রোগের স্বরূপ নির্ণয় করেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তেমনি কোন ব্যক্তির বাড়িতে কাজের তাগিদে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আসা-যাওয়া দেখে মানুষটি কেমন তা নির্ণয় করেন।

তে খল্বাত্মে বিবেকজ্ঞাস্তে সভ্যা ইহ কৃতলে।
আগচ্ছন্তি গৃহে যেষাং কার্য্যার্থং সুহৃদোজনাঃ॥

অর্থাৎ তারাই তো খাঁটি মানুষ, যাদের বাড়িতে প্রত্যহ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা নিজের নিজের প্রয়োজন মেটাতে আসা-যাওয়া করেন। এই লক্ষণগুলি দেখেই মানুষের চরিত্র নির্ণয় করেন বিজ্ঞেরা। এর বিপরীত হলে, অর্থাৎ যার বা যাদের বাড়ীতে কেউ আসেনি, তারা সমাজে মৃত বলে গণ্য হন এবং তাদের সংখ্যা পাঁচটি।

জীবন্তোঽপি মৃতাঃ পঞ্চ স্মরন্তে কিল ভারতে।
দরিদ্রো ব্যাধিতো মূর্খঃ প্রবাসী নিত্য সেবকঃ॥

অর্থাৎ বেঁচে আছে প্রাণে, কিন্তু তাদের বাঁচা মৃত ব্যক্তির তুল্য। যেমন দরিদ্র ও নিয়ত ব্যাধিগ্রস্ত এবং মূর্খ, আর প্রবাসেই থাকে আর কারোর বাড়িতে পেট-ভাতে থেকে চাকরী করে।

চাণক্য দেখেছেন স্বদেশেই এক স্বভাবের মানুষ থাকে না বা থাকতে পারে না, আকৃতির তারতম্য যেমন থাকে, তেমনি প্রকৃতির তারতম্যও থাকে। এটা শুধু মানব কেন, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয়, যে দেশেরই মানুষ হোক, বিদেশে গেলে নিজের প্রকৃতি বা নিজের স্বভাব অনুযায়ী সঙ্গী পেয়ে যাবেই যাবে, এ ক্ষেত্রে মানব একা।

মৃগাঃ মৃগৈঃ সঙ্গমনুব্রজন্তি গাবশ্চ গোভিস্তুরগা স্তুরঙ্গৈঃ।
মূর্খাশ্চ মূর্খৈঃ সুধিয়ঃ সুধীভিঃ সমানশীল ব্যসনেষু সখ্যম্॥

অর্থাৎ যে কোন দেশ থেকেই হরিণ অন্য দেশে যাক, সে কিন্তু সে দেশের হরিণের সঙ্গে ভাব জমাবেই, এমনি

গরু, ঘোড়া প্রভৃতিও। আবার মানুষের মধ্যেও থাকে। অল্প মূর্খ হলে সে অল্প দেখে গিয়ে মূর্খকে খুঁজে নেয়। বিদ্বান খুঁজে নেয় বিদ্বানকে, এমনকি তার যাতে নেশা থাকে, জুয়া তাস, পাশা, মদ, নাচ-গান, ঈশ্বরীয় গুণগান, সভা সমিতি করা, অর্থাৎ নিজের স্বভাব অনুযায়ী বন্ধু খুঁজে নেয় এবং পায়ও। চাণক্য তাদের উদ্দেশ্য করেই বলেছেন, ওহে বাপু! মনে কোরো না, আমার মন খুব শক্ত, কারোর কথা কানে নিয়ে চলে পড়ি না। না, না, ওটা অহংকারের স্বভাব, ভাখো—

কোমল পাতলা জল, সেও যদি বেশ কিছুদিন ধরে পাহাড়ের কঠিন পাথরে পড়তে থাকে, তবে সেই পাথরও ক্রমে ক্রমে গর্ত হয়, কেটে যায়। আর মানুষের চিত্ত তো পাথরের চেয়ে কত কোমল, সেই চিত্তে যদি কারো লাগানি কথা প্রত্যহ কিছু কিছু পড়ে, তবে সে চিত্তে কি দাগ পড়বে না? অবশ্যই দাগ পড়বে। এই লাগানি কথাতেই তো সমাজ, রাষ্ট্র পরিবার ভাঙে। তারও পর যদি অশিক্ষিত ব্যক্তির মন বা চিত্ত হয় তবে লাগানি কথায় কতক্ষণ চিত্ত স্থির থাকে?

কর্ণ বিষেণ চ ভাতঃ কিং কিং ন করোতি বালিশো লোকঃ।
কণপকতাবাপি ধত্তে পিবতি সুরাং নরকপালেন॥

অর্থাৎ মূর্খের কান এমনি যে, যে কোন লাগানি কথায় অল্প সময়েই একটা হেস্তনেস্ত করে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ওই মূর্খেরা যখন তান্ত্রিকদের পাল্লায় পড়ে, বার বার তন্ত্রের কথা শুনতে শুনতে এমন হয়ে যায় যে মদ-মাংস খেতে খেতেই খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া আর মহামায়া আর ভৈরবীর চর অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় ঐ ভাবেই। এঁদের চরিত্র অর্থাৎ লাগানো-ভাঙানো কথাগুলি শুনে যাদের চরিত্র বলতে যায় (অবশ্যই যাবে) তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়: বাপু হে! সমাজে তোমরা এমন প্রাণী যে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

'বিষাক্ত সাপকে মাড়ালে কিংবা লাঠি পেটা করলে সে কামড়ায় এবং তার বিষে মানুষ মরে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তির কানলাগানি বিষ এমনি, যার কানে কুটিল লাগানি বিষ ঢালে সে মরে না, কিন্তু মরে অন্য ব্যক্তি। তাই বলছি, মানব সমাজে তোমরা সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রাণী', তাই সহজ কথায় বলছি—

'খল ব্যক্তিরাও এক ধরনের বিষধর সাপ। বিষধর সাপ কামড়ায় যাকে সে মরে, আর খলরা যার কানে লাগান বাজান করে কামড়ায়, তাতে সে মরে না, মরে অন্য ব্যক্তি।'

চাণক্য ছিলেন নিষ্ঠাবান বাস্তববাদী। তাই তিনি বলেছেন, এক শ্রেণীর মানুষ অনাগতবিধাতাবাদী আর এক শ্রেণীর মানুষ প্রত্যুৎপন্নমতি। অন্য শ্রেণীর মানুষ, ভাগ্যে থাকে তো হবে।

অনাগত বিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিস্তথা।
আবতৌ সুখমেধেতে যদ্ ভবিষ্যো বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ এক শ্রেণীর মানবমন সর্বদা কর্মতৎপর হয়ে থাকে, যে ভবিষ্যৎ আসেনি তার জন্য চুপ করে বসে থাকবে না। আর এক শ্রেণীর মানুষের মন, যখন যা করতে হবে, তখন বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। আর এক শ্রেণীর মন, যা ঘটবে তার প্রেরণাও আসবে। মানুষের কী সামর্থ? তিনি যা করান তাই করতে হবে।

চাণক্যের অভিমত প্রথম দু-শ্রেণীর মানব সুখী হয়, তার তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের বিনষ্টিও তার হাতে।

চাণক্যের আর একটি সমীক্ষা বিশ্বের মানবমনের অখণ্ড প্রবৃত্তি যেমন, খণ্ড খণ্ড প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে ঐক্য

তেমনি কতক মন এমন আছে বিদেশে গিয়ে বাস, সেই স্থানের গতি প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। তাই পানীয়গুলিকে একেবারে নিজের বিপরীত প্রবৃত্তি বিপরীত ভেবে একলাও দেশ ছেড়ে যেতে চায় না। এ ধরনের বুদ্ধি বিদ্বানের হয় না।

'বিশ্বের বিদ্বানদের মন স্বদেশ স্বদেশ করার ছলে অলসের মন নিয়ে বসে থাকে না। তারা সর্বদাই ভাবে কিসের কষ্ট? যেখানে সব পরকে আপনার করে নেবো। দেহ তো অনন্তকাল থাকবে না, আর জাতপাত বংশধারা এদের কোনটাই তো অক্ষয় নয়।'

যারা ভিন্ন দেশে গিয়ে বাস করাকে ভয় পায়, পরকে আপন করতে নানান্ বাধায় জড়ায়, তারা তো নপুংসক। নিজের দেশে থেকে নূতনের আঘাত পেতে চায় না, তারা স্বদেশে থেকেই ঘরে সুখ পায়—যেমন কাক, কাপুরুষ এবং অন্যান্য পশু হরিণ প্রভৃতি।

যাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে তারা কি স্বদেশ স্বদেশ করে নিজেকে নষ্ট করে?

'ওই সব জড় বুদ্ধি ব্যক্তি স্বদেশ স্বদেশ করে বাইরের আলো পায় না, নিজেদের মনগড়া কথা কাহিনী নিয়ে জীবন কাটায়, আর কেবলই কুয়োর জল যা বাবা খেয়েছেন, আমার স্বদেশের ওই শ্মশানেই তাঁদের দেহ চিতায় দাহ হয়েছে, আমারও তাই হবে।' এঁদের অলস জীবনের জড়তা মূর্খতাকে তারা বলে এই হলো স্বদেশ-অনুরাগ।

মানবের মন বা মানব-চরিত্রের এক বিশেষ দিক হলো, কেউ কারোর প্রতি হেতুমুক্ত আসক্ত হয় না, যে আসক্তিটিকে মনে হয় এটা ভক্তিচিত্তের স্বভাব। চাণক্য বলেছেন ভক্তি শব্দের অর্থ যা, তা কিন্তু অকারণ কোন প্রসঙ্গ থেকে আসে না। ভক্তির কারণটা হয় সেখানে ভয় থেকে মুক্তি পাবার কারণ থাকে (মুক্তি অপবর্গ এক জাতীয় প্রলোভন) অথবা প্রলোভন থাকেই থাকে।

আর একটি স্বভাব মানুষের—কাউকে খুব আদর যত্ন করে তাকে আপন করার ইচ্ছা, এই আচারটি নিজের সন্তান হলেও খুব সূক্ষ্মতঃ সেখানেও বহুদূর বিশেষভাবে হেতু লুকিয়ে থাকে, তবে সে হেতুটি শংকা করা যায় না। কিন্তু অন্যত্র—

অত্যাদরো ভবেৎ যত্র কার্যাকারণবর্জিতঃ।
তত্র শংকা প্রকর্তব্যা পরিণামেঽসুখাবহা॥

অর্থাৎ, কার্য্য কারণটা কী তা প্রত্যক্ষত জানা যাচ্ছে না, অথচ সমাদর খুব, সেখে শংকাই করতে হয়, পরিণামে এই আদর দুঃখের বা অসুখের কারণ হবে না তো? এই শংকা থাকে।

চাণক্য দেখেছেন মানব মনের কত বিচিত্র রূপ। রূপগুলি ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের যে কোন দেশে মানবাকৃতির প্রাণী আছে, তাদেরই মন আছে, আর সেই সব মনের যত অভিলাষ, তাদের সঙ্গে সঙ্গেও কত বিচিত্র শাখাপ্রশাখার মত অভিলাষ থাকে। বিশেষ করে ঈর্ষা বা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অপার সুখ। অপরের বিত্ত, মান, কুল বা বংশ প্রভৃতি যা কিছু, সবার উপরেই ঈর্ষা করা, নিজের অবস্থাকে ক্ষুণ্ণ মনে করে অপরকে তুলনামূলক বড় ভাবাটাকে যেন প্রতিপক্ষ ভেবে কেমন এক অব্যক্ত পোষণ করে। এটা সর্বদাই লোকলোচরে আসে, যেমন—

'মানব সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, পরিণত সমাজে উচ্চ এবং নীচ বড় এবং ছোট এ কেমন একটা ভেদ

থাকেই থাকে। উচ্চ কুলের মানুষ (অর্থাৎ বিদ্যা ও বিত্তের অধিকারী উচ্চ কুল) নীচ বা ছোট কুলে জাত মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখবেই। হতভাগ্য ব্যক্তিরা অধিকতর ভাগ্যবানকে একটু ঈর্ষার চোখে দেখে। আবার কৃপন ব্যক্তিরা দাতাকে, কুটিল বা সরলকে সরল কুটিলকে, ধনী দরিদ্রকে, দরিদ্ররা ধনী ব্যক্তিকে, কুৎসিত চেহারার ব্যক্তিরা সুরূপ ব্যক্তিকে, আবার সুরূপ ব্যক্তিরা কুরূপ ব্যক্তিকে, কিংবা ধর্মাশ্রয়ীরা অধার্মিককে, অথবা অধার্মিক ব্যক্তিরা ধার্মিককে, আবার শিক্ষিতরা মূর্খকে, কিংবা মূর্খরা শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটু অবজ্ঞার এবং নিম্ন নজরে দেখেই থাকে।' এই বক্তব্যটি চাণক্যের বানিয়ে বলা নয়, কতকাল থেকে মানব মনে বাসা বেঁধে আছে। তাই আর একটু সংক্ষেপে তিনি বলেছেন—

মূর্খানাং পণ্ডিতা দ্বেষ্যা নির্ধনানাং মহাধনাঃ।
প্রতিনঃ পাপশীলানাং অসতীনাং কুলস্ত্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ, যারা মূর্খ তারা কি পণ্ডিতদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না? করে বৈ কি! যারা দরিদ্র তারাও বিদ্বেষ করে ধনীদের, আর সমাজ পাষণ্ড বা দুরন্ত ব্যক্তি তারাও বিদ্বেষ করে ধার্মিক ও সদাচারীদের। আর চঞ্চল চরিত্রের রমণী এমনকি যাদিকে বোঝা যায় এরা দেহকে পণ্য করে জীবনযাপন করে একটা বিদ্বেষ আবেগে স্ফূর্তি পায়, তারা সতী রমণীদের বিদ্বেষ করবেই।

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

শ্রীতেজেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণে আগে লিখেছি : "কোনো গণ্ডী, গোষ্ঠী বা ভাবের সঙ্গে তিনি বেশিদিন একাত্ম থাকতে পারেননি। বিচ্ছিন্নতাবেদনা মর্মে বেজেছে; বৃহত্তর জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের উদ্দেশে আকুল হয়ে উঠেছেন। এইভাবে একাত্মতার পরিধি ক্রমশ বিস্তারিত হয়েছে। বিমুক্তিবোধ—বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সংগ্রাম—নবস্তরে সংযুক্তি; fission feud fusion : রবীন্দ্রমানসপ্রগতির এই হচ্ছে ডায়ালেক্‌টিক। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সহজাত নয়, তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসজাত।" রবীন্দ্রনাথের নিজের ও তাঁর জীবনীকারদের লেখায় নিঃসঙ্গতাবোধ বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই নিঃসঙ্গতাবোধের কারণ এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা। বিশেষ পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের ফলে, রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, এ বোধ হয় বিতর্কাতীত সত্য। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ও মরমী কবিচিত্ত একদিকে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের অভিলাষে, বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের প্রচেষ্টায় সদাসচেষ্ট; অন্যদিকে অচলায়তনের নিগড়ে বাঁধা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজ থেকে স্বকীয় মুক্তমনের বৈশিষ্ট্য, মার্জিতরুচি ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় অধিষ্ট; রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য এর সমর্থনে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখবোধ হয়—সাধারণত মানুষের সঙ্গ আমাকে বড় বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়—আমার চারিদিকেই এমন একটা গণ্ডী আছে, যা আমি কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারিনে। ···অথচ মানুষের সংসর্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাও নয়। থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে—মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ, সেও যেন প্রাণ ধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাসে যারা সংকটের দ্বারা মনকে ভ্রান্ত করে দেয় না, এমনকি যারা আনন্দ দান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।" প্রভাতকুমার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, জীবনের সন্ধ্যায় লিখিত কবির 'ঐকতান' কবিতায় এই কথারই প্রতিধ্বনি।

কবির কবিতা বিচিত্রপথে আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু সর্বত্রগামী হয়নি। এই সর্বত্রগামী না হতে পারার ব্যাখ্যা প্রবন্ধের শেষের দিকে এইভাবে দিয়েছি: "তিনি সমাজসচেতন, আশাবাদী, মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী; যদিও এ-বিশ্বাস, এ-আশা কোনো বিপ্লবী বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানবসত্তার জয়, মানুষের বিচ্ছিন্নতার অবসান, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে একাত্মতা, সর্বশেষে মানুষের মুক্তি,—বিশ্বনিখিলের সঙ্গে, কালমনের সঙ্গে অভিন্নতাপ্রাপ্তি—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিরকালের স্বপ্ন ও এর জন্য আজীবন চলেছিল তাঁর সাধনা।"

কালমনের সঙ্গে, বিশ্বনিখিলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অভিন্নতা নিয়ে আলোচনার যে-সূত্র আগেই তুলে ধরেছি, সেই সূত্র ধরে আরো কিছুদূর অগ্রসর হতে চাই। এই বিচ্ছিন্নতাকে কেউ কেউ কালিক বা 'এক্সিস-

টেনশিয়াল আউটকাষ্টনেস্' বলে অভিহিত করেছেন। জন্ম-মৃত্যু-জীবন নিয়ে প্রচলিত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ধারণা সব মানুষকে প্রভাবিত করে, কবিকে তো করবেই। বলা হয়ে থাকে ধার্মিক ব্যক্তির উপর এই ধরনের প্রভাব বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। যিনি ঈশ্বরে ও জন্মান্তরে বিশ্বাসী, তাঁর জন্মমৃত্যু দিয়ে সীমিত জীবনকে "a short time spent in a physical world with inscrutable void on the other side" মনে হবে না। মনে হলেও এই ধরনের চিন্তা বিশ্বাসীর জীবনকে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করবে না। পশ্চিমী সভ্যতাপুষ্ট মানুষ সাধারণত জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটির ভাবধারায় আচ্ছন্ন। প্রাক্-বিজ্ঞান যুগে পাপকার্যে আসক্ত হবার ফলেই মানুষের মনে ঈশ্বর-ত্যক্ত বা স্বর্গোদ্যান থেকে পতিত হয়েছে; এই বিশ্বাসের উদয় হল। নানা উপাচারে ঈশ্বরের সন্তোষবিধান দ্বারা পাপক্ষালন করে ঈশ্বরের সুনজরে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। উনিশ শতকের পূর্বে আমরা যাকে বলি কসমিক বা 'এক্সিস্টেনশিয়াল আউটকাষ্টনেস্' তদানুরূপ কোনো মানসিক অবস্থা খুবই বিরল ছিল। বর্তমানে অস্তিবাদী ভাবধারা প্রসারলাভ করেছে। জীবনের অস্তিত্বের কোনো সুসংগত অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র বিজ্ঞানের ফুসে যাদের ছিন্ন হয়েছে, তারা মনে করেছে যে, এই যাবজ্জীবনের কয়েকটি বছরের অস্তিত্বের কোনো অর্থ আরোপ যদি করতেই হয়, সে-অর্থ মানুষকেই আবিষ্কার করতে হবে। স্বভাবত সে-অর্থ হবে একান্ত ব্যক্তিগত ও অন্যের জীবন বা ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। সর্বগ্রাহ্য অর্থ বা সত্য কিছু নেই। "Truth is subjective and solipsistic।"

সেদিন আর নেই, যখন মনে করা যেত যে, এক বিজ্ঞ পরমকারুণিক পরমেশ্বর অনেক ভাবনা-চিন্তা করে মানুষের জন্য এই বিশ্বনিখিল সৃষ্টি করেছেন; যেখানে সত্য অবজেক্টিভ এবং সেই সত্যকে আশ্রয় করে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইসব কথা পশ্চিমী দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিকরা প্রচার করেছেন এবং ইয়োরোপ-আমেরিকার এই ধারণা বিস্তার লাভ করেছে। কিয়েরকগার্ড অস্তিবাদী দর্শনের জনক। দুই বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর এই নতুন বিষয়ীগত (সাবজেক্টিভ) ধ্যানধারণা ক্রমশ শিল্পী-সাহিত্যিককে বিশেষভাবে সংক্রামিত করেছে। কাম্যু, সার্ত্র, জ্যাসপার, রিলকে, ক্রাউস, কাফকার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে 'কসমিক আউটকাষ্টনেস্' প্রতিফলিত; রবীন্দ্রনাথ এঁদের সকলের না-হলেও, অনেকেরই প্রায় সমসাময়িক। কসমিক বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল কিনা এবং প্রকাশ পেয়ে থাকলে সেই প্রকাশের কোনো পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা—এই আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক হলেও, ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নধর্মাবলম্বী। উপনিষদের ব্রহ্ম ও আত্মার ধারণা বোধ হয় কিশোর বয়স থেকে তাঁকে প্রভাবিত করেছে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবই ব্রহ্মাশ্রিত। বিশ্বনিখিল ব্রহ্ম হতে সৃষ্ট, ব্রহ্ম-কর্তৃক রক্ষিত, আবার ব্রহ্মে গিয়ে লীন হচ্ছে। কর্মফলে মানুষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। জন্মজন্মান্তর ধরে কর্মস্রোত প্রবাহিত। তবে মুক্তিরও নির্দেশ আছে। মুক্তির উপায় ব্রহ্মোপলব্ধি। তাঁকে জেনে জীব মরণ এড়ায়। মরণ এড়ালে আর জন্মলাভ করতে হবে না। পশ্চিমী ধ্যানধারণার সঙ্গে বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু জায়গায় মিলও রয়েছে। অস্তবাদী ধ্যানধারণার মূলগত ঐক্যকে অস্বীকার করা চলে না। হিন্দু দর্শনের মায়াকে যদি Phenomenon বলি, আত্মাকে Noumenon বলতে পারি। আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, পশ্চিমী দর্শন, ও জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটির

ভাবধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞ ছিলেন না। তবে একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কবনিক ধারণা বোধহয় এদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সর্বভূতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব কল্পনা এবং মৃত্যুর পর আত্মার যে কোনো জৈব ও অজৈব বস্তুতে বিচরণ বোধ হয় ভারতীয় চিন্তার এক বিশিষ্ট দিক। কাজেই অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বনিখিল সংক্রান্ত চিন্তায়, জন্মমৃত্যু-রহস্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী কবি-দার্শনিকের সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও, অমিল ও পার্থক্য যথেষ্ট থাকবার কথা। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি ও দেশের অগণিত লোকের দারিদ্র্য তাঁর চিত্তলোককে স্বভাবতই ব্যথিত করেছে ও তাঁর জীবনদর্শনকে ও কাব্যপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। দেশকালের প্রভাব থেকে কোনো কবিই মুক্ত হতে পারেননা। রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাবিচারে একথা উল্লেখ্য যে, তিনি নিজে হিন্দু প্রকৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় প্রকৃতির কোনো বিশেষ বিরোধ দেখছেন না। "হিন্দু প্রকৃতির সহিত ইউরোপীয় প্রকৃতির কোনো বিরোধ নাই ; কেবল বর্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জীব পৌত্তলিকতা ও বিকৃত-কিমাকার বিকৃত হিন্দুয়ানিই যথার্থ অহিন্দু।" ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত ডিরোজিওর ভাবধারায় প্রোৎসাহিত, তবু সমন্বয়াত্মিকতায় দক্ষ একইভাবে অনুপ্রাণিত, কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনিখিলচিন্তা, জীবনমৃত্যুচিন্তা পশ্চিমী চিন্তা থেকে অংশত বিভিন্ন আবার অংশত অভিন্ন। এই সম্পর্কে তুলনামূলক কোনো প্রবন্ধের মাধ্যমে যদি বিভিন্নতা অভিন্নতা দৃষ্টান্ত সহকারে কোনো রসজ্ঞ সমালোচক তুলে ধরতে পারেন, তবে রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে নতুন পথের পথিকৃৎ হবেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও অমরতা সম্পর্কে ধারণা এই প্রসঙ্গে এসে পড়বে। কবনিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে মৃত্যু ও অমরত্বের ধারণা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কুড়ি বছরের রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কবিতার বিষয়বস্তু করলেন কেন? মৃত্যু বিরহরিষ্টা রাধিকার কাছে শ্যামসমান। মৃত্যু বিচ্ছিন্নতা দূর করে অনন্ত-প্রেমের বন্ধনে বিরহিনীকে অনন্তকাল ধরে রাখবে। মৃত্যু কিশোর রবীন্দ্রনাথের কল্পনার জীবনযন্ত্রণা এড়াবার উপায় নয়, মিলনানন্দ লাভের উপায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মীভূত হবার দুর্বার আকুতি কি রবীন্দ্রনাথকে 'মরণ' কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল! এর মধ্যে নৈরাজ্যবাদের ছায়া নেই, ব্যর্থতার বা বঞ্চনার জ্বালাও অনুভূত হয় না। এর মধ্যে পশ্চিমী 'আউটসাইডার'-এর মৃত্যুপ্রীতির লক্ষণ নেই। অমরত্বের বাসনা তরুণ কবিকে তাড়িত করেছে, একথাই মনে হয়। 'প্রাণ' কবিতায় সুন্দর ভুবনে কবি মরতে চান না, মানবের মাঝে বাঁচতে চান। আরো অনেক সহজ ও স্পষ্টভাবে মৃত্যুকে অস্বীকার করার বাসনা। জন্ম ও মৃত্যু (নৈবেদ্য) কবিতা দুটিতে জন্ম-মৃত্যুকে অজানা-অচেনার জগৎ থেকে অতিপরিচিতের স্তরে নিয়ে এসেছেন সুন্দর কয়েকটি পংক্তির মধ্য দিয়ে। জন্ম-প্রাক্কালে এ জগৎসংসার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; "কিন্তু নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম | নিতান্ত পরিচিত—একান্তই মম।" মৃত্যুও অজ্ঞাত, কিন্তু তাতে ভীত হবার কি আছে? মৃত্যুর প্রভাত। সেই অচেনার মুখ ফেরিবি আবার | মুহূর্তে চেনার মত।" জীবনকে যেমন ভালবেসেছি, জীবনান্তের জীবনকে তেমনিই ভালবাসব। মৃত্যুর পর এই রকমেরই অন্য একটি জীবন অপেক্ষা করছে। মৃত্যু জীবন থেকে জীবনান্তরে যাবার বাহন। মিথ্যাই ভয়। "জন্ম হতে ভুলে মিলে কাঁদে শিশু ভয়ে। মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে জনান্তরে।" জন্মান্তরবাদের উপর অবিচলিত বিশ্বাস এই দুই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুভয় আছে, আবার সেই ভয় দূর করবার

মাঝে বাণীও আছে। অস্তিত্ববিলোপের ভয় জয় করবার অটোসাজেশন কবিকে অনেক দিতে হয়েছে। "কেন এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়। জয় অজানার জয়।" "মরণকে তুই পর করেছিস তাই। জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই। দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে—তাইতে যদি এতই ধরে,—চিরদিনের আবাসখানা সেই কি মৃন্ময়। জয় অজানার জয়।" এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে, কবি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকেই চিরকালের আবাস ভাবছেন। এই ইহলোকে যেন দুদিনের জন্য প্রবাসে এসেছেন। ব্যক্তিসত্তাকে ব্রহ্মসত্তাতে লীন করবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে যে-অমরতার বাসনা দেখা যায়, তা আমাদের দৃষ্টিতে অবাস্তব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় নয়। অন্য একটি সঙ্গীতে বলেছেন, "মরণ সাগর পারে তোমরা অমর। | তোমাদের স্মরি। নিমিষে ঘটিয়া গেলে আপনারই ঘর, | তোমাদের স্মরি। সংসারে জ্বেলে গেলে নব আলোক। জয় হোক জয় তারি জয় হোক।" ইহলোকে সত্যের অমর দীপ জ্বালিয়ে অমরত্বের বাসনা এখানে সহজভাবে ফুটে উঠেছে। যখন এপারে গান বা সাহিত্যসৃষ্টির প্রদীপে অমরতার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তখন ওপারে যাবার আগে অস্তরবাণীর সাজেশনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না। অন্যথা গাইতে হচ্ছে, "জয় তৈরব জয় শঙ্কর। জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর, শঙ্কর শঙ্কর।" কিন্তু কোনো সময়ই কবি দুঃখ বা মরণের কাছে পরাজয় মানতে রাজী নন। "দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন— | পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন।" এই জীবনের বাধা এখানেই ফেলে রেখে বিনাবাধায় প্রয়াণ করবেন। এই ভাবে দুঃখ এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কবিচিত্তে বলিষ্ঠতার অভাব অনুভূত হচ্ছে কি? "মরণরে তোর নয় রে চিরন্তন—দুয়ার তার পেরিয়ে যাবি। ছিঁড়বে রে বন্ধন। | এ বেলা তোর ঘরি বাড়ে, পূজার কুসুম ঝরে পড়ে, | যাবার বেলায় তরবে থালায় মালা ও চন্দন।" বলিষ্ঠতার অভাব নয়, ইহজীবন-পরজীবনের মধ্যে সংযুক্তি সাধনের কামনা প্রকাশ পাচ্ছে এই কথাগুলির মধ্যে। কর্মিক বিচ্ছিন্নতাবোধও সেই বিচ্ছিন্নতাবোধের নিম্নসপ্তকে এইভাবে বহু রাগরাগিণীতে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। তা বলে কি এই ধরণীকে ভাল বাসেনি? সবাই কি ইহজগতের বাসিন্দা হয়ে পরজগতের আকর্ষণ অনুভব করছেন? না। "যেতে যদি হয় হবে | যাব যাব যাব তবে।" এই ধারার কত ভাবে কত কাজে সুখে দুঃখে সাজে গরবে বহুকাল কাটিয়েছেন, স্রোতে ভেলা ভাসিয়েছেন, আনমনে বেলা কাটিয়েছেন। কত ভালো লেগেছে উদাসমনে সাদা কালো মেঘের খেলা। কিন্তু ডাক এলে মুহূর্তে পাট চুকিয়ে যাত্রার জন্য কবি প্রস্তুত। "নেওয়া নেওয়া যাবে চুকে, বোঝা খলে যাওয়া বুকে | যাব চলে হাসিমুখে—যাব নীরবে।" এখানে ভাল লাগলেও, ভিড়তা সহ্য না হলেও কবি অন্তলোকের ডাকের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এই বৈরাগী মনোভাব আরো নানা গানে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। পশ্চিমী বিচ্ছিন্নতার কোনো আভাস এই মনোভাবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। যখনই এই জগৎ-সংসারের মায়া-মরীচিকার অন্বেষণে ক্লান্তি মন ছুটতে চেয়েছে, যখনই প্রশ্ন জেগেছে, "পথের শেষ কোথায়, কি আছে শেষে | এত সাধনা এত কামনা কোথায় মেশে?" তখনই অন্তরতর কণ্ঠস্বরে শুনে উঠেছেন, "যাত্রাবেলায় অন্তরতর বন্ধনভোর ছিন্ন হবে। | ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে। মুক্ত আমি রুদ্ধদ্বারে বন্দী করে কে আমারে | যাই চলে যাই অন্ধকারে ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা-বারে।" —জীবনসন্ধ্যার মৃত্যুর অন্ধকারে পাড়ি জমাতে কখনই পরাঙ্মুখী নন কবি। ইহজীবনকে স্বীকার করে, অনাসক্ত বন্ধনকে ফেলে দিয়ে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সাহসের অভাব নাই-ঘটে, এই

দিকে কবির সদাসতর্ক দৃষ্টি।

ভয় যে নেই এমন নয়। "যাও হে আমার ভয় ভেঙে যাও / আমার দিকে ও মুখ ফেরাও।" অথবা "আর নহে আর নহে, আমি করি নে আর ভয়।" ইত্যাদি লাইন ভয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জন্ম-মৃত্যু নিয়ে বার বার ধোকাপড়ার চেষ্টা চলছে। 'জন্ম' ও 'মৃত্যু' কবিতার পর দুবছরের মধ্যেই "জন্ম ও মরণ" (উৎসর্গ)-এর মধ্যে সেইভাবে অটোসাজেশন দেবার চেষ্টা চলছে। একমাত্র জনম সফল করে এসে প্রবাসী কবি এই পৃথিবীতে স্নেহপ্রীতি পেয়েছেন; মানুষের প্রীতি তাঁর কণ্ঠ থেকে সঙ্গীত নিঃসৃত করছে। এখানে প্রেমে বাঁধা পড়েছেন। তবু এখান থেকে চলে যেতে হবে বলে ভয় বা দুঃখের কিছুই নেই। নব নব প্রবাসে এইভাবে নূতন প্রেমে বাঁধা পড়তে তাঁর এতটুকুও দেরী হবে না। নব নব পুষ্পদলে ভুবনে ভুবনে তিনি বিকশিত হয়ে উঠবেন। এখানেই, এই ভুবনেই মৌরসি পাট্টা নিয়ে চিরকাল বসে থাকবেন কেন? দেশে দেশে যার ঘর, তার আবার ভাবনা কি? একই জায়গায় স্থাণু হয়ে বসে থাকতে কে চায়? "কে চাহে সংকীর্ণ ক্ষুদ্র অমরতা কূপে / এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে, বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।" পার্থিব অমরত্বের কাঙাল নন কবি। মৃত্যুর মাধ্যমে নব-নব জন্ম নিয়ে অনন্ত জীবনস্রোতে তিনি প্রবাহিত হতে চান।

উৎসর্গের বিখ্যাত কবিতা 'মরণ-মিলনে' কবির নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ের স্বাক্ষর।

মরণ এখানে আবার ভানুসিংহের আমলের প্রণয়ী। চুপি চুপি ধীর পদে এসে কবির চোখে চোখ রাখতে চাইছে। প্রণয়ের এ-ধরণ কবি পছন্দ করলেন না। মরণ আসবে, নিঃশব্দ মৃত্যুর কোলে চলে পড়বেন; এইভাবে মৃত্যুর কাছে পরাভব মানতে কবি রাজী নন। এই মহামিলনে কোন সমারোহ থাকবে না কেন? ভ্রমরের মত গুঞ্জরী বাজিয়ে মিলনের সংকেত জানাবে, এই ধরনের গোপন প্রণয়ের আর তিনি পক্ষপাতী নন। চোরের মত এসে তাঁকে অবশ করে হরণ করে নিতে তিনি দেবেন না। শ্মশানবাসী বিলোচন নন্দীভৃঙ্গী ইত্যাদিকে বরযাত্রী নিয়ে মেরিনী কাঁপিয়ে মিলনের জন্য আসবে। রক্তবসনে সাজিয়ে, বিজয়শঙ্খ বাজিয়ে, কোনদিকে বিক্ষিপ্ত না করে তাঁকে সকল কাজের মাঝ থেকে প্রকাশ্যে টেনে নিয়ে যাবে তাঁর ঈপ্সিত জীবনস্বামী, এই তাঁর প্রার্থনা! কোলাহলে, বাজরোলে, আকাশ বাতাস ভরে যাবে, ভূতভৃত্যে দশদিশি কাঁপতে থাকবে, এখানকার আত্মীয়-পরিজন চোখের জল মুছতে থাকবে, আর তিনি মহাআড়ম্বরে ঈশানের জ্বালাময় বিদ্যুৎচমকের মধ্যে মৃত্যুতরণীতে গিয়ে আরোহন করবেন। "আমি ফিরিব না করি মিছি ভয়। আমি করিব নীরবে তরণ। সেই মহাবরষায় রাঙা জল। ওগো মরণ, হে মোর মরণ।" কবিতাটি পাঠ করে আগেকার দিনের সতী-সাধ্বীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহমরণের ছবি মনে পড়বে। অবশ্য সেখানে মৃত্যুর ডাক আসত মৃত স্বামীর কাছ থেকে; এখানে ডাক আসছে ভূতনাথের কাছ থেকে! সেখানে সাহস জুগিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে লোকাচার, সংস্কার এবং বিচ্ছেদের বেদনা; আর এখানে প্রেরণা দিচ্ছে "কসমিক এলাইনমেন্ট" বা মহাজাগতিক বিজিগিষা। বিশ্বনিখিলের অণুপরমাণু থেকে সৃষ্ট মরদেহ বিশ্বনিখিলে লীন হবার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। জীবনের দুয়ারের সামনে মৃত্যুর ভেরী বাজছে, খণ্ডজীবনের কাছে অখণ্ড জীবনপ্রবাহের আহ্বান এসেছে। আর দেরী নয়। অথবা বলা চলে, মৃত্যুকে প্রেমিকরূপে আবাহন করে মৃত্যুকে জয় করবার এই প্রচেষ্টা সফলের

কাছে আত্মসমর্পণের এক সুন্দর কাব্যরূপ। এর মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধির সহজ প্রবৃত্তি অভিব্যক্ত হয়েছে। যা ঘটবেই, যা অপ্রতিরোধ্য, আগে থেকে তার চিন্তা করে তাকে সহনীয় করার প্রচেষ্টা কবির মধ্যে পরিলক্ষিত। একে একটি চিত্রাচরিত ভয় দূর করবার প্রথা বলা চলতে পারে। সেই অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু এর ফলে তাঁর কাছে শুধু সহনীয় নয়, মহান ও বরণীয়ও হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিমনে বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে রিক্ততাবোধ আছে, পাশ্চাত্যদেশীয় তিক্ততা নেই। সীমাহীনের প্রতি আকর্ষণ আছে কিন্তু সীমাবদ্ধতার প্রতি ঘৃণা নেই। খৃষ্টিও-গ্রীয় পাপবোধ রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাবোধের অভিব্যক্তির মধ্যে নজরে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ সাবজেক্টিভ হয়েও আত্মকেন্দ্রিকতার রূপমণ্ডুক নন।

মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে **Development estrangement** বলেছেন, তার পরিচয় পাই '২৫শে বৈশাখ' কবিতাতে। জগতের সব ব্যক্তিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বালকের মধ্যে শিশুকে পাওয়া যায় না, বৃদ্ধের মধ্যে যুবককে দেখা যায় না। আমেরিকার ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-অনুসন্ধানী কেনিস্টন ছাত্রদের মধ্যে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার সন্ধান পেয়েছেন। **"These 'alienations' which I will call 'development estrangement' are critical and salient in the lives of alienated students but comparable, if milder, estrangement exists in the lives of all" (Kenistan : The Uncommitted)**। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "একদিন ছিলেন বালক। তোমরা তাকে কেউ জান না। সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে, না আছে কারো স্মৃতিতে।" আবার অন্যত্র : "পঁচিশে বৈশাখ তারপর দেখা দিল আর এক কালান্তরে। তরুণ যৌবনের বাউল সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে।" আর এক পঁচিশে বৈশাখে যুবক রবীন্দ্রনাথ এসে সেদিনকার কিশোরের একতারাতে চড়িয়ে দিলেন নতুন তার। আবার বিরোধ-সংক্ষোভের দিনে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথকে আবাহন করতে এসেছে নতুন তরুণের দল।

পঁচিশে বৈশাখ জন্মদিনের ধারাকে বহন করে মৃত্যুদিনের দিকে এগিয়ে চলে; ছোটো-ছোটো জন্ম-মৃত্যুসীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা গাঁথা হতে থাকে। রথে চড়ে এগিয়ে চলেছে কাল ; রস পান সারা হলে পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে পদাতিক। চাকার তলায় ধুলোয় ভাঙাপাত্র গুঁড়িয়ে যায়। নতুন পাত্র নিয়ে যে ছুটে আসে, সে নতুন রস পায়। "একই তার নাম | কিন্তু বুঝি সে আর একজন।"

কোনো বিচ্ছিন্নতাবোধ বা মানসিক কোনো ধর্মই স্বভাবগত নয়। জন্মসূত্রে পাওয়া মস্তিষ্ককোষের টাইপবৈশিষ্ট্য পরিবেশগত বিশেষ-বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষভাবে আত্মীকরণ করতে পারে, একথা কিন্তু অস্বীকার করা চলে না। ভারতীয় ঐতিহ্যবিশিষ্ট পরিমণ্ডল কবির অভিসংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রে পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ দুয়েরই সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই বৈপরীত্যের কথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। অন্তর্বিষয়ী ও বহির্বিষয়ী এই বৈপরীত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি একদিকে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" ও অন্যদিকে "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়",—উল্লেখ করেছেন। অন্তর্জগত ও বহির্জগতের বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ প্রয়াসে কবি সততই সচেষ্ট অন্তর্মনস্কতা বহির্বাস্তব-বিচ্ছিন্নতার বিলোপ

চাইছে, আবার বহির্সত্তা একই সঙ্গে অন্তরসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতানিরসনের উপায় খুঁজছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটিতে। "ওরে তুই ওঠ আজি | আজও শোনেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি | আকাশে অলখজনে | কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে | পুরুতল।" পলাতক বালকের বহির্বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন মানসের অলস মধ্যাহ্নের বাঁশী বাজানো বন্ধ হল। ক্রমাগত স্কুলের প্রতি শ্লেষাত্মক ব্রিটিশের অত্যাচারের সংবাদে বাঁশী ফেলে কবি গর্জে উঠলেন। 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দেবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সংসারের তীরে ফিরতে চাইছেন। আর অপরূপবেশ, নতুনতর আচার নিয়ে সঙ্গীহীন হয়ে সৃষ্টিছাড়ার মত দিন কাটাবেন না। কিন্তু কিছু পরেই দেখা গেল "বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার", তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। কেন বের হয়েছিলেন, তা যেন ভুলে গিয়েছেন। অনেকের মধ্যে, রূঢ় বাস্তবের মধ্যে এসে আবার কল্পনা রঙ্গময়ীর ছলনায় মুগ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নয়, ব্যষ্টিতের ক্রন্দন নয়, ওঁকে ডাকছে সেই রঙ্গময়ী। তিনি চলেছেন "ওঁর কাছে জীবন সর্বস্ব ধন সঁপিয়াছি যারে | জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।" আবার অজ্ঞের রহস্যময়তা বা অসীমের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। মানুষের দুঃখে আত্মবিসর্জন বিশ্ব-প্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতাকে বলি দেবার বিমূর্ত কল্পনা ওঁকে পেয়ে বসেছে। সব অস্বীকার, মানুষের দুঃখবেদনার অংশীদার হবার শপথ বিস্মৃত হয়ে তিনি মহিমান্বিতার বরমাল্যখানি কণ্ঠে ধারণ করে রুদ্ধ অশ্রুজলে তাঁর চরণযুগল ধুয়ে দিয়েছেন। বহির্জগতের তাকে বহির্বিচ্ছিন্নতা দূর করবার ইচ্ছা অন্তরজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। মহিমান্বিতার বরমাল্যখানি লাভ করবার বাসনার মধ্যে অমরতার আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে। এই কল্পনিক-বিচ্ছিন্নতাভীতি তাঁর কবিতাকে সর্বজনগামী করল না। চাষী-কৃষাণের জীবনের শরিক হতে পারলেন না। 'ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' গিয়েও ভিতরে প্রবেশের শক্তি পেলেন না। দয়া ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও 'জীবনে জীবন যোগ করা' সম্ভব হল না। সাধারণের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তাঁর ঘুচেই গেল, দূর হল না। তবু আন্তরিকতা হারালেন না, বেদনাবোধ নষ্ট হল না। মানুষের ওপর বিশ্বাস বজায় রেখে উচ্চতর মানবধর্মের সন্ধানে অন্ধ মানুষকে অনুপ্রাণিত করলেন। কাফকার মত নিজের জগতে বন্দী থেকে বললেন না "I am separated from all things by a hollow space and I do not even reach to its boundaries। স্পেংলারের মত প্রগতি নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন না; নীৎসের মত এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না যে, "Oh, that I am banished | from all truth | Mere fool! Mere poet!" কামুর মত 'মিথ অফ সিসিফাস' নিয়ে গবেষণা করেননি। ফ্রিলকের মত দেবদূত বা হুপারম্যানের আবাহন করেননি। 'ঐ মহামানব আসে' কবিতায় সেইরকম তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। ঈশ্বরের পতনের ফলে ইয়োরোপের চিন্তাবিদ্ কবি-সাহিত্যিকদের মনে নতুন ঈশ্বর সৃষ্টির প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তার অপ্রত্যক্ষ ফল হিসেবে একনায়কত্বের জন্ম,—একথা বললে বোধহয় অতিকথনের দোষ ঘটে না। অবশ্য ধনতন্ত্রের উৎপাদন শক্তির অগ্রগতি ও বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের বলিষ্ঠ তৈরীর সব কিছু শর্ত আগে থেকে হয়ত প্রস্তুত করেছিল; তা বলে ভাবধারার জগতের এই প্রবণতাকে ছোট করে দেখা কিছুতেই চলে না।

মৃত্যু ও অমরত্বের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই।

অমরত্বস্পৃহা মানে কেবল মৃত্যুকে অস্বীকার নয়; মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লোক-লোকান্তরে, জন্ম-জন্মান্তরের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে বেঁচে থাকবার বাসনার মধ্যে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা আছে। মরদেহ বিনষ্ট হবেই; "Biological death is inevitable"। ব্যক্তির খণ্ডজীবনের সঙ্গে সে তাই অতীতকে সংযুক্ত করতে উন্মুখ, ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত দেখতে উৎগ্রীব। ব্রহ্মের মধ্যে লীন হয়ে অথবা জন্ম-জন্মান্তরের চক্রে আবর্তিত হয়ে অমরত্বের কল্পনা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব। কেননা রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন এই ধরনের অমরত্বচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ। লিফটন লিখেছেন; "The sense of immortality is much more than a mere denial of death, it is part of compelling, life enhancing imagery binding each individual person to significant groups and events removed from him in place and time, (Lifton : Revolutionary Immortality, Pelican). "It is the individual's inner perception of his involvements in what we call the historical process" (Ibid). সাধারণ মানুষ সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়ে অমরত্ব চায়, ধর্মনির্ভর মানুষ মৃত্যুর পরজীবনে বিশ্বাস করে অমরত্বের স্বপ্ন দেখে অথবা অন্যভাবে কোনো ধর্মীয় প্রথায় মৃত্যুকে জয় করতে চায়। সাধুসন্তরা নানারকম ধ্যানধারণা, যৌগিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি অভ্যাস করে জীবনকে নিশ্চল করে রাখতে চান, সাময়িকভাবে সমরকে তাঁরা জয় করে (কয়েক সেকেণ্ডের জন্য) মনে করেন বুঝি কালজয়ী হয়েছেন। শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকেরা সৃষ্টি ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে চান। কেউবা নিজেকে অজৈব অপরিবর্তনীয় জড়জগতের সঙ্গে একাত্মীভবনের চিন্তা করে নিজেকে মৃত্যুজয়ী মনে করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তিন দিক থেকে অমরত্বসাধনার সম্ভাবনা ছিল। জন্ম-জন্মান্তরের কল্পনা, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং সাহিত্যসৃষ্টি; এই তিন দিক দিয়েই তিনি অমরত্বের সাধনা করেছেন। যেসব কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে মৃত্যু-পরলোকের কল্পনা আছে বা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং পরমব্রহ্মের সঙ্গে লীন হবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে, সেই সব কবিতা-সঙ্গীত অমরত্ব-লাভের ব্যাপারে তিন দিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সাহিত্যকৃতির চেয়ে কালিক একাত্মতার মধ্য দিয়ে যেন বেঁচে থাকতে তিনি বেশি উৎসুক। নিজের স্থানকালের মধ্যে থেকে অতীতের সঙ্গে সেতু রচনা করেছেন, অবার কল্পনার পাখায় ভর করে ভবিষ্যতের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন "to maintain an inner sense of continuity with what has gone on before and what will go on after his own individual existence" (Ibid)। লক্ষকোটি বৎসর ধরে যে-শুকতারা অপলোক দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে, তার সঙ্গে এক হয়ে লক্ষকোটি বৎসর পেছনে চলে যেতে সক্ষম। আবার অনেক দূরভবিষ্যৎ অবধি লোক-লোকান্তরে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের একটি অম্লান পারিজাতের মালা কণ্ঠে ধারণ করে তিনি অমর থাকতে চাইছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে বুঝি শুধুই বিরোধ। কিন্তু আদলে জীবন ও মৃত্যু সুপ্ত মানসে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে সম্বন্ধিত। আত্মরক্ষামূলক ও প্রজাতি সংরক্ষণমূলক সহজাত শর্তহীন রিফ্লেক্স (Instinctive Unconditioned Reflex) সকল প্রাণীর মধ্যেই বিদ্যমান এবং পরস্পর সাপেক্ষ।

আত্মরক্ষা থেকে প্রজাতি সংরক্ষণ প্রবৃত্তি অনেক সময় বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতির জন্য অনায়াস আত্মবিসর্জনের পেছনে গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতির সঙ্গে নানা সামাজিক প্রক্রিয়ায় একাত্মীভবনের প্রক্রিয়াও অনেকখানি কাজ করে থাকে। গোষ্ঠী, জাতির জীবনধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য ব্যক্তির খণ্ডজীবন বলিদানের মধ্যে গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রবণতা পরিদৃষ্ট নয় কি? অতীতের অজানা পিতৃভূমি থেকে ভবিষ্যতের অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রপুঞ্জ অবধি প্রবাহিত ব্যক্তিজীবনের অখণ্ড বিস্তারকল্পনা বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানীতে অভিব্যক্ত, তাকে প্রজাতি সংরক্ষণ-প্রসূত কাব্যদর্শনাশ্রিত ভাববাদীরূপ বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভাববাদদর্শনের অবিনশ্বর অখণ্ড ব্রহ্ম প্রজাতির অমরত্বের প্রতীকরূপ। ব্রহ্মস্বরূপে স্থায়ী আত্মনিলয় গঠন; স্পেসিস্ বীইং-এর (Species being) কাছে 'সেলফ' (Self)-এর আত্মনিবেদন। দার্শনিকের এসেন্স (essence)। বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীর কাছে 'স্পেসিস্ বীইং'-এর বিমূর্ত কল্পনা। কলবিক বিশ্লিষ্টতার মধ্যে Species annihilation (প্রজাতি ধ্বংস)-এর সম্ভাবনা দেখেছেন কবি, তাই বোধহয় বারবার কলঙ্কের সঙ্গে একাত্মীকৃত হবার আকুতি।

(বিশ্লিষ্টতার ভবিষ্যৎ—১ম খণ্ড থেকে পুনর্মুদ্রিত)

বিবিধ

যুব মানসিকতার বিকৃতি

যদিও এককালে শৈশবকাল বলতে শিশুর জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত সময়কে ধরে নেওয়া হোত, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এবং মনঃসমীক্ষনের আবির্ভাব ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিভাগ অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এখন এই সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করে তাদের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। যেমন, (১) জন্ম থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়সকালকে বলা হয় শিশুকাল। তারপর থেকে ২ এগার-বার বছর বয়স পর্যন্তকে অর্থাৎ নবযৌবন আগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্তরটিকে বলা হয় অপ্রকাশকাল বা latency period এবং তৃতীয় (৩) স্তরটিকে এককথায় যৌবনকাল বলে অভিহিত করা হয়।

এই ছোট প্রবন্ধটিতে আমি এই বয়সের ছেলে-মেয়ে বিশেষকরে ছেলেদের সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করছি। বিশেষকরে যারা ধরা-বাঁধা নিয়ম বহির্ভূত চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং সেজন্য অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতে তাদের আচার ব্যবহারগুলি সংযত না করে অসংযত প্রকাশে বেশী আনন্দ পায় এবং যখন অসংযত আচরণের অস্বাভাবিকত্ব বুঝতে পেরেও সেই আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

এই মানসিকতার ছেলেমেয়েরা প্রায়ই অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকাংশে নিগৃহীতও হয়। এই নিগ্রহকে তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল বলে স্বীকার করে নিতে পারে না। উত্তরোত্তর তাদের বিকৃতি বেড়েই যায়, শেষপর্যন্ত কিছু কিছু ব্যক্তি হাজত বাস করে। সামান্য কিছু মানসিক হাসপাতালে আশ্রয় পায়। এদের মধ্যে কিছু ধ্বংসাত্মক রাজনীতিক কর্মে নিযুক্ত হয়ে সাময়িকভাবে নিজেকে ফিরে পায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহননের দিকে এগিয়ে চলে। আজকের দিনে এই আত্মহননকারি একটি দলকে আমরা বলছি drug addict বা 'নেশাখোর'।

যুবমানসের এই অবনতি এত দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, একে ঠেকাবার সরকারি প্রচেষ্টা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। আমার কথা সরকার বোঝেন তাঁরা যা করছেন সেটা শুধু মাত্র। সেই সঙ্গে দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এগিয়ে না আসে বা বেসরকারি ক্ষেত্রে আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠে তাহলে আশু কাজ প্রগতিশীল হবে না। যোদ্ধা কথা বর্তমানে যা হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশী হওয়া দরকার, মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিষয়টি আরো বেশী করে গঠনমূলক চিন্তা করা দরকার।

যেমন উপরি বয়সের বিশেষ করে ছেলেদের কথাই বলি, যদিও যত দিন যাচ্ছে মেয়েরাও এই পথে পা বাড়াতে শুরু করেছে। মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই নেশার পথে যারা আগুয়ান হয় এবং যারা অল্পদিনের মধ্যেই 'নেশাখোর' হয়ে পড়ে তাদের পারসোন্যালিটি বা ব্যক্তিত্ব অন্য স্বাভাবিক যুবক-যুবতীর ব্যক্তিত্ব থেকে কিছুটা ভিন্ন। বলা যায় এদের personality বা ব্যক্তিত্ব অন্য যুব ব্যক্তিত্ব তুলনায় দুর্ব। এবং

মনোভ্রান্তি দূর করতে হলে বক্তৃতার দ্বারা সৎ-পরামর্শ বা অনুমাত্র ডাক্তারি ঔষধ প্রয়োগে তা সম্ভব নয়। আসলে যেটি করা দরকার তা হোল রুগ্ন ব্যক্তির অভ্যাসের পরিবর্তন করা। বদ অভ্যাস দূর করে সৎ অভ্যাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই কাজে মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে রোগীর অভিভাবকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন করে তাকে যথা কিছুদিন রাখতে পারলে আরো ভাল নয়। দরকার হলে এরূপ ব্যক্তিকে উপযুক্ত হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা দরকার। প্রয়োজন মত মনঃসমীক্ষণী মনোবিদ্যার সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযজ্ঞপতি ঘোষ

সোভিয়েত ইউনিয়নে অপরাধ প্রবণতা

মস্কো, ১৪ ফেব্রুয়ারি, (নোভস্তি): সোভিয়েত ইউনিয়নে এতদিন অপরাধ-সংক্রান্ত সংখ্যাতথ্য প্রকাশ করা হতো না। ১৯৩৩ সাল থেকেই এরকম অবস্থা চলছিল। গতকাল গৃহমন্ত্রকের এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংখ্যাতথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

মন্ত্রকের তথ্য দপ্তরের প্রধান মেজর-জেনারেল আনাতোলি শিরনভ বলেন যে অপরাধ-সংক্রান্ত তথ্য হাতের কাছে না থাকলে শাস্তি দেবার সবচেয়ে আধুনিক ব্যবস্থাও কার্যকরী হবে না।

তিনি বলেন এ-বিষয়ক তথ্য খুব একটা সন্তোষের বিষয় নয়। গত বছরে সারা দেশে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ৬৮৭০০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮৩৭,২২৩। সবগুলি অন্ধ-প্রজাতন্ত্রে রাস্তাঘাটে সংঘটিত অপরাধও এর মধ্যে আছে। একমাত্র অজিরাই এর একমাত্র ব্যতিক্রম।

এই একই ধরনের ব্যাপার ঘটছে পূর্ব পরিকল্পিত খুন (১৯৮৭ সালে হয়েছিল ১৪,৬৪১টি, ১৯৮৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬,৭১০), ধর্ষণ (১৯৮৭ সালে ছিল ১৬,৭৩৫টি ১৯৮৮ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,৬৫৮) ডাকাতি (১৯৮৭ সালে ছিল ৯০৪৭, ১৯৮৮ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৯১৬), ছিনতাই (১৯৮৭তে ছিল ৪৬,৪৮৪, ১৯৮৮ সালে ছয় ৬৭,১১৪টি) আর গুণ্ডামি (১৯৮৭ সালে ছিল ২৮,২৫০টি, ১৯৮৮ সালে তা দাঁড়ায় ৩৭,১২১টি), ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

তবে তহবিল তছরুপ, চুরি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি ও জনগণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ঘটনা ১৯৮৭ সালের ২৬,৯৮৬-র তুলনায় ১৯৮৮ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৮৭,৪৫৫-টিতে। জালিয়াতির সংখ্যা ১৯৮৭ সালের ২৩,৮১৭-টির তুলনায় গত বছরে ২১,৫৪৩-এ এসেছে।

জেনারেল শিরনভ বলেন যে আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত লোকেদের ৩২ শতাংশ মানুষকে এখন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে এখন নতুন ফৌজদারি আইন নিয়ে দেশে যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলছে তা কার্যকরী হলে এই সংখ্যা কমে ২৪ শতাংশ হতে পারে।

১৯৮৪ সালে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল। তারপর থেকে এই অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। গত দু'বছরে এই সংখ্যা ৪০ শতাংশ কমেছে।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের এক-তৃতীয়াংশ পরেও দুটির বার অপরাধ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে বিদেশী নাগরিকদের অপরাধ, মূলত বে-আইনী, কালোবাজারি, বেড়ে গেছে।

এখন থেকে বেশে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে সাংবাদিকদের নিয়মিত খবরাখবর দেওয়া হবে।

অপরাধ অপরাধী অসুস্থতা

পর্যবেক্ষণ : সমাজজীবনে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা, আর্থিক অবস্থা পুরুষ, নারী নির্বিশেষে) বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ না পেয়েই মানুষ অপরাধের আশ্রয় নেয়। প্রত্যেকটা অপরাধ আবার একাধিক মানুষের সামনে নতুন একাধিক সমস্যা সৃষ্টি করে। এর ফলে পুনরায় কিছু অপরাধ সংঘটিত হয়। এইভাবে সমাজ ক্রমশঃ অপরাধ ও সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ে।

পিছন ফিরে তাকালেও একই দৃশ্য দেখা যায়। হাজার হাজার বছর ধরে অপরাধ দমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাধ দূর করা সম্ভব হয়নি। বরং অপরাধের ধরন ও প্রতিরোধ পদ্ধতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। সাময়িকভাবে কোনও এলাকায় বিশেষ কোন অপরাধ বন্ধ হয়েছে। কখনও বিশেষ কোনও ব্যক্তি অপরাধ করা থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্রমশঃ আরও ব্যাপকভাবে অপরাধ ও সমস্যার ভরে উঠেছে।

অপরাধের পদ্ধতি, স্থান, কাল, পাত্র বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কিন্তু সমস্ত অপরাধের উৎস বা কেন্দ্রবিন্দু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুটি—সম্পদ ও যৌনতা।

প্রচলিত ধারণা হল সহজাত প্রবণতা অথবা স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করে। কঠোর শাস্তিমূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকলে অপরাধ হতে পারে না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কঠোরতর হলে অপরাধের ধরন পরিবর্তিত হয়, কিন্তু নির্মূল হয় না।

বিশ্লেষণ : আগাছার মূল বজায় রেখে, তার ডাল পালা ছেঁটে সাময়িকভাবে আগাছামুক্ত থাকা যায়। কিন্তু কিছুদিন বাদে আবার নতুন ডালপালা বেরোয় এবং ছেঁটে পরিষ্কার করতে হয়। এইভাবে ডালপালা গজানো এবং ছেঁটে ফেলা চলতে থাকে। প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি, সময়, অস্ত্র বা পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু তাতে স্থায়িভাবে আগাছামুক্ত থাকা যায় না। মুক্ত হওয়ার বাস্তবসম্মত উপায় হ'ল আগাছার মূল নির্মূল করা।

অপরাধকে যদি আগাছা মনে করা হয়, তবে শাস্তির পদ্ধতি পরিবর্তন করে সাময়িকভাবে অপরাধমুক্ত থাকা যেতে পারে। কিন্তু স্থায়িভাবে অপরাধমুক্ত হতে হলে অপরাধের মূল কারণ দূর করা ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত পথ থাকে না।

প্রশ্ন : ১। শাস্তি প্রধান পদ্ধতিতে অপরাধ দমন যদি সঠিক পথ হয় তবে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করেও অপরাধ দূর করা সম্ভব হয়নি কেন?

২। তবে কি অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ প্রচলিত ধারণার কোনও ত্রুটি আছে ?

অনুমান : ১। প্রকৃতপক্ষে অপরাধ হয়তো দূর করা সম্ভব নয়।

২। হয়তো অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত দীর্ঘ প্রচলিত ধারণা সঠিক নয়। অপরাধের পিছনে অন্য কোনও কারণ সক্রিয় থাকে, যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে অপরাধ দূর করা সম্ভব হবে।

অনুসন্ধান : আমাদের লক্ষ্য অপরাধ দূর করা। তাই দ্বিতীয় অনুধানের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল। এই বক্তব্যগুলো আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

১। ভৌতবিজ্ঞান : প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুই কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। পদার্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল জাড্যতা। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করা না হলে পদার্থ তথা বস্তুর অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না।

২। জীবনবিজ্ঞান : জীব-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল উদ্দীপনা।

১। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে উদ্দীপকের প্রভাবে জীবের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপনার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

২। জীবদেহের গঠন উপাদান হ'ল একাধিক মৌলিক পদার্থ। তাই পদার্থের বৈশিষ্ট্য 'জাড্যতা' জীবের মধ্যেও বর্তমান।

৩। জীব-এর অন্যতম জৈব চাহিদা হ'ল অস্তিত্বরক্ষা ও বংশবিস্তারের চাহিদা।

৩। শরীরবিজ্ঞান :

১। মানুষ যেহেতু জীব এবং মানবদেহের গঠন উপাদান কতগুলি মৌলিক পদার্থ, তাই 'জীব ও জড়' এর বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যেও বর্তমান।

২। প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন মানুষের গঠন উপাদান, ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ ক্ষমতা, স্নায়ুর সংবেদনশীলতা গ্রন্থির সক্রিয়তা এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের হয়।

৪। মনোবিজ্ঞান :

১। মানুষের মনের প্রধান তিনটি ধর্ম হল উত্তেজনা, নিস্তেজনা ও গতিময়তা। উদ্দীপকের প্রভাবে ক্রোধ, আনন্দ, উদ্যম, উচ্ছ্বাস, সাহস ইত্যাদি উত্তেজনামূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আবার হতাশা, বিষাদ, ভয়, দুঃখ, অক্ষমতা প্রভৃতি নিস্তেজনামূলক প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া অনুসারে মস্তিষ্কের নির্দেশে বিভিন্ন গ্রন্থির রসক্ষরণের তারতম্য ঘটে এবং কাজ বা আচরণের মধ্যে দিয়ে মূলের গতিশীলতা প্রকাশ পায়।

২। আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে জৈব চাহিদা (অস্তিত্বরক্ষা ও বংশবিস্তার সংক্রান্ত) এবং প্রক্ষোভমূলক চাহিদা (স্নেহ, ভালোবাসা, নিরাপত্তা, সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি

সংক্রান্ত)। বাহ্যিক উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে চাহিদাগুলি পরিপূরণের ক্ষেত্রে অভাব, বাধা, বৈধতা, অতৃপ্তি ইত্যাদি। তাছাড়াও দৃশ্য, শব্দ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, চাপ, তাপ, প্রশংসা, নিন্দা, ভালোবাসা, ঘৃণা, অবজ্ঞা, প্রলোভন ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় আছে যা বাহ্যিক উদ্দীপকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

৫ **চিকিৎসাবিজ্ঞান :** উদ্দীপকের প্রভাবে মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের জৈব ধারণাত্মক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে দেহ ও মনে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীরের নিজস্ব প্রাকৃতিক প্রতিরোধ পদ্ধতিতে এই অস্বাভাবিক অবস্থা কেটে যায়। কিন্তু যখন তা সম্ভব হয় না, তখনই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার সাহায্যে এই অস্বাভাবিক বা অসুস্থ অবস্থাকে স্বাভাবিক বা সুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। দেহ যেমন অসুস্থ হয়, মনও তেমনি অসুস্থ হয়। মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের পিছনে থাকে মানসিক অস্বাভাবিক বা অসুস্থ অবস্থা। দৈহিক অসুস্থতার মত মানসিক অসুস্থতাও মোদ্দা বিষয়।

৬। **সমাজ বিজ্ঞান :** প্রাকৃতিক জীব হিসাবে মানুষের মৌলিক জৈব চাহিদা হ'ল অস্তিত্বরক্ষা ও বংশবিস্তার। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের এই দুটি বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক অর্থনীতি ও যৌননীতির মাধ্যমে। এই দুই নীতির সুস্থতার উপর নির্ভর করে সামাজিক সুস্থতা। সমাজব্যবস্থা যত সুস্থ হবে সমাজের মানুষের আচরণও তত সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও যৌননৈতিক অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে তা সমাজের ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ও যৌননৈতিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন মাত্র।

৭। **অপরাধ বিজ্ঞান :** ১। কোনও মানুষ অপরাধী হয়ে অথবা অপরাধী হওয়ার জন্য জন্মায় না। মানুষের মধ্যে অপরাধী হওয়া বা না হওয়া দু'ধরনের সম্ভাবনাই সুপ্ত থাকে। পরিবেশের প্রভাব ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে কোনও একটি সম্ভাবনা প্রকট হয় অথবা প্রচ্ছন্ন থাকে।

২। মানুষের সমস্ত অপরাধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে সম্পদ (অস্তিত্বরক্ষা) বা যৌনতার (বংশবিস্তার) সাথে। এই দুটির যে কোনও বিষয়ে বিশৃঙ্খলা বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে অপরাধ সংঘটিত হয়।

পর্যালোচনা : জল একটা প্রাকৃতিক জড় পদার্থ, যা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তরল অবস্থায় থাকে। কিন্তু জলের মধ্যে বরফ অথবা জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তাপমাত্রার তারতম্য হলে এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়। কিন্তু এর জন্য জলকে দায়ী করা যায় না। কারণ প্রাকৃতিক কার্যকারণ শর্ত (আত্যন্তা) অনুসারে এটা হতে বাধ্য। একইভাবে মানুষের গঠন উপাদান যেহেতু জড়পদার্থ তাই স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক আচরণ করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের (উত্তেজনা ও নিস্তেজনা) সম্ভাবনাও সুপ্ত থাকে। অবস্থার তারতম্য হলে (প্রাকৃতিক, সামাজিক) যে কোনও সম্ভাবনা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে। কিন্তু এর জন্য মানুষকে দায়ী করা চলে না। কারণ প্রাকৃতিক কার্যকারণ শর্ত অনুসারেই এটা হয়।

চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে বাধা, অভাব ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলে জীবদেহে উদ্দীপক সৃষ্টি হয়। এর

ফলে জীবদেহে জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং উত্তেজনা বা নিস্তেজনা অনুসারে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে। কিন্তু এর জন্য জীবকে দায়ী করা চলে না। কারণ প্রাকৃতিক কার্যকারণ সূত্র (উদ্দীপনা) অনুসারেই এটা হয়। উন্নত জীব হিসাবে মানুষের চাহিদা বহুমুখী ও বিচিত্র। এই চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে বাধা, অভাব, অতৃপ্তি ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপনার প্রভাবে মানবদেহে জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজনা বা নিস্তেজনামূলক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে। কিন্তু এর জন্য মানুষকে দায়ী করা চলে না। কারণ প্রাকৃতিক কার্যকারণ অনুসারেই এই প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক কারণে কোন দুটি মানুষ ঠিক এক ধরনের হতে পারে না। একই কারণে দুটি মানুষের রাসায়নিক গঠন, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, গ্রন্থি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির কার্যক্ষমতা ঠিক সমান হয় না। তাই একই পরিস্থিতিতে দুটি মানুষের উদ্দীপনা, পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। একই পরিস্থিতিতে কেউ ভয় পায় আবার কেউ ক্রুদ্ধ হয়, কেউ আনন্দ পায়, কেউ দুঃখ পায়। এর জন্য মানুষকে দায়ী করা চলে না। কারণ প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্পর্ক (গঠনগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্য) অনুসারেই উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ারও তারতম্য হয়।

চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে অভাব, বাধা, বৈষম্য, অনিশ্চয়তা, অতৃপ্তি ইত্যাদির কারণে মানুষের দেহ ও মনে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে রক্তশূন্যতা, বন্ধ্যা, চর্মরোগ, হাঁপানী, হিষ্টিরিয়া, উন্মাদনা, শুচিবায়ু, পক্ষাঘাতগ্রস্তি, কামশীতলতা, রক্তে শর্করার হ্রাস-বৃদ্ধি, আলসার, রক্তচাপ হ্রাস-বৃদ্ধি, ক্যান্সার, স্নায়বিক দুর্বলতা, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দৈহিক বা মানসিক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এগুলোকে অসুস্থতা মনে করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

একই কারণে জন্ম নেয় হিংসা, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, ধর্ষণ, অনাচার, ব্যভিচার, বিকৃতাচার, হত্যার প্রবণতা ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুস্থতা হিসাবে চিহ্নিত না করে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির বিধান দেওয়া হয়।

অতীতে একটা সময় ছিল যখন অসুস্থতার (কুষ্ঠ, বন্ধ্যা, বসন্ত, সিফিলিস, হিষ্টিরিয়া, উন্মাদনা ইত্যাদি) কার্যকারণ সম্পর্ক এবং প্রতিরোধের উপায় জানা ছিল না। এই সময় অসুস্থতার জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা হত। মনে করা হ'ত যে অসুস্থতা হ'ল মানুষের পাপ বা অপরাধ। এই ধারণার ভিত্তিতে অসুস্থ ব্যক্তিকে কখনও হত্যা করা হ'ত, কখনও নির্বাসন দেওয়া হ'ত। আবার কখনও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হ'ত।

কিন্তু জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে মানুষ ক্রমশঃ বুঝতে পারে যে অসুস্থতার পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে জীবাণু সংক্রমণ, শারীরবৃত্তির ত্রুটি, অনিয়মিত জীবনযাত্রা, আবহাওয়া পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ, এবং চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে বাধা, অনিশ্চয়তা, অভাব ইত্যাদি। সেই অনুসারে চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তুলে এবং পারিপার্শ্বিক কিছু পরিবর্তন করে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। অনুন্নত বহু এলাকার মানুষ এখনও অসুস্থতা সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার ভিত্তিতে শাস্তির বিধান দেয়। কিন্তু কোনও যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ নিশ্চয়ই অসুস্থতাকে পাপ বা অপরাধ বলে চিহ্নিত করবেন না।

('অধিক' বারুইপুর কর্তৃক প্রেরিত প্রবন্ধটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।)

টেলিভিশন : শিল্পীদের জবরজঙ্গি ক্ষত বিষয়ক

বিষয়টা বিজ্ঞানসম্মত বাস্তববাদী এবং পারতপক্ষে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেই যদি দেখার চেষ্টা করা যায় তবে দেখা যাবে আমরা কোথায় দাঁড়াই। একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার বলে রাখি শিশুদের ভালোমন্দ আর বড়োদের ভালোমন্দ মূলগতভাবে একই খাতে বইছে, অবশ্য ছোটদের ক্ষেত্রে নানা কারণেই শর্ত এবং পরিপ্রেক্ষিত বহির্গতভাবে একটু আলাদা। ভালোমন্দের ব্যাপারটা সামগ্রিকভাবেই দেখা উচিত। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবংবিধ অনেকগুলি মাত্রাই এটার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ব্যাপারটা আদৌ কেবল ছোটদের নিয়ে নয়। পুকুরের জল পচলে বড়োমাছ ছোটমাছ কেউই ভালো থাকে না।

মোটরগাড়ির চল শুরু হবার পর দুর্ঘটনা বেশি হচ্ছে এই অজুহাতে মোটরগাড়ির বদলে গরুরগাড়ি চালু করলে তা হাস্যকরই হবে। ১৯৫৯ সালে টিভির প্রথম আবির্ভাব ঘটলেও আজকের ভারতবর্ষে ৯৩ লক্ষ টিভি সেটে প্রতিদিন গড়ে ৫·৫ কোটি মানুষ দূরদর্শন দেখে থাকে। লেখাই বাহুল্য এজাতীয় একটা শ্রুতিদৃশ্য মাধ্যমকে শিক্ষা এবং বিকাশমূলক কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের বদলে মোটাদাগের বিনোদন, চটকদারী বিজ্ঞাপন তথা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বেশি কাজে লাগানো হয়ে থাকে। গ্রাম ও শহরের খেটে-খাওয়া মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, তাদের বিবর্তন বা মুক্তির সঙ্কট সম্বলিত সমস্যাগুলির কতোটুকুইবা এই 'অভিজাতদর্শন' পাওয়া যায়। ক্ষেত্রটাকে ছোট করেই কোকান করা যাক।

যথোচিত ব্যবস্থা, প্রয়োগিক কলাকৌশল এবং দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিহীন হলে টিভি সুফল এনে দিতে অনেকাংশেই সাহায্য করতে পারত যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অনেকটা সম্ভব হয়েছে। এখানে দিনে দিনে অবস্থা এমন হচ্ছে যে বাজার দোকানেও বিশেষ বিশেষ দিনে বিক্রিবাটা কমে যাচ্ছে; মানুষ সন্ধ্যেবেলা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি যেতেও কিন্তু কিন্তু করে। ব্যক্তিতান্ত্রিক মনোভাব আরো সুদৃঢ় হচ্ছে। ছোট পরিবারের কর্তা-গিন্নী এবং সত্যি বলতে অধিকাংশ সময়ে তাদের এক অথবা দুই নয়নপুত্তলিও ঐ টিভির সামনে বসে; ছোট পরিবারের অন্য সন্তান অনেক ক্ষেত্রেই মানসিকভাবে একটু একা; এই ধরনের শিশুরা প্রথম থেকেই টিভিতে অধিক মনোনিবেশ করে থাকে। বাবা-মা দুজনেই উচ্চাভিলাষী, প্রায় পরিবারেই তারা চান তাদের প্রিয় সন্তানটি ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি হোক; সে বিষয়ে দুর্বার চেষ্টা আছে, কিন্তু বাচ্চার আত্মিক জগতের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবার সময় তাদের কম; সকলেই কর্মক্লান্ত থাকছেন, ব্যস্ত থাকছেন—সহজলভ্য আরাম আনন্দ ও বিনোদন বলতে ফ্যামিলি মেম্বারের মতো বাস্তুটি। টিভির সামনে বসলে হাজার হাজার দুঃসহনীয় অবস্থা বা প্রতিকার-দুঃসাধ্য ব্যবস্থাকে সহজেই ভুলে যাওয়া যায়। ছায়াময় রঙ্গীয়তার মধ্যে পাশাপাশি বসে টিভিতে ডুবে রয়েছে বাড়ির মানুষেরা; পারস্পরিক আদানপ্রদান লোপাট হয়ে যাচ্ছে; অন্তত বাস্তবনিষ্ঠ ভাবনা, প্রতিবাদী চেতনা অল্প কুণ্ঠিতে চালানি হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন একটু একটু করে। এজন্যই কি একে 'ইডিয়ট বক্স' বলা হয়! শুনেছি বুদ্ধিজীবিরা কবাচ টিভি দেখে থাকেন। শুনেছি পশ্চিম জার্মানীতে টিভি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে সম্প্রতি। আমাদের দেশেও অনেক সচেতন সক্রিয় মানুষ 'রাজদর্শনের' বিরুদ্ধে কুঁখছেন, 'মিশি-কুটুরকে' আপাদিয় করছেন না তেমনভাবে—চাকাও ঘুরেছে সামান্য।

বহির্জগতের ৮০ ভাগ উদ্দীপকই দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্ক কেন্দ্রে পৌঁছায়। তাই শিশুদের জন্য প্রতিদৃশ্যময় কোন প্রতিবেদন, সিনেমা ইত্যাদি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিষয়-ভাব নির্বাচন ইত্যাকার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ হওয়া দরকার। অনেক বাচ্চাকেই দেখি বিজ্ঞাপনের জনি সংলাপ বা অন্যবিধ অনুপুঙ্খ আপাদ বলে যেতে। বোকা বোকা সংলাপের কতো ভাকা সুন্দরী বা উটকো রকমের স্মার্ট নায়ক মনে গেঁথে বসে যায় রোজ, বিশেষত কাঁচামনে। 'কেয়ারফ্রি' চালচলন থেকে অনুকৃতির কতো অ্যাবজোর্বে শুরু চৈনী চিত্রবাণীর আনাগোনা। বাড়তি পাওনা আবার সিনেমা: এরপর আছে নিশিরাতের ছবি। 'এ' মার্কা ভিটামিন (!) মিশিয়ে বিনোদনের তরলকেপিতে টান দিচ্ছে দেশবাসীদের। তা ছাড়া অন্যান্য দিনের ছবিও আছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র উৎপাদনকারী (১৯৮৪ সালে ৮৩৩টি) দেশ, অথচ বেশীরভাগ ছবিই সার্থক আনন্দ দিতে পারে না; সব ছায়াছবি শিল্পসৃষ্টি নয়; অথচ খাদ্যের মতো চলচ্চিত্রেরও ভালোমন্দ গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন আছে। শিল্পের চরিত্রও ক্রমে হস্তাবলেপে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার সৃষ্টিকর্তাদের কথা ভাবলে অনুভূতিসম্পন্ন যুক্তিবুদ্ধির মানুষ অন্তত নিজেকে চোখ ঠেরে আর চলতে পারবেন না। প্রতিদিন ৭ কোটি ভারতবাসী গোগ্রাসে টিভি এবং সিনেমার অনেক অখাদ্য খাচ্ছে।

শিশু চলচ্চিত্র সংখ্যায় খুবই কম। বাবা বিশেষ করে মায়েদের সঙ্গে বসে শিশুরাও জ্ঞানবৃদ্ধ হচ্ছে। মেয়েদের পরিসর ছোট এমনিতেই, টিভি তাই ওদের প্রমোদের সিংহভাগ দখল করে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ছেড়ে দিই—সেখানে মানুষ গড়ে ৭ ঘন্টা করে টি ভি বা টেলি দেখে থাকে। ড্রাগ অ্যাডিক্টের মতো অনেকে টিভি অ্যাডিক্ট (দূরদর্শন আসক্ত) হয়ে পড়েছে। আজ অধিকাংশ দেশেই দূরদর্শনই কিশোর অপরাধ প্রবণতার উৎস, একথা বলা হচ্ছে। নামমাত্র কিছু দেশে শিশুদের জন্য দূরদর্শনের উপস্থাপনা বিষয়ে সেনসরের ব্যবস্থা চালু আছে। বেশ কিছু *Sex-Violence* মার্কা ছবি দেখানো হচ্ছে। অকালপক্কতা বাড়ছে আর অন্ত প্রবণতা বাড়ছে কিনা রোজকার নানা ঘটনা ও খবরকাগজই তার সাক্ষী। একুশ শতকে যারা দেশকে রক্ষা বা গঠন করবে তাদের মানসিক ভিত গড়ছে কারা, আমরাই তো? আমরাও কি একই গোয়ালে রয়েছি?

দূরদর্শন দেখার স্থায়ী অভ্যেস কায়েম হলে মানুষের নিষ্ক্রিয়তাও অনেকগুণ বেড়ে যায়। সবকিছুই টিভির মাধ্যমে পাওয়া যাবে। সুন্দরী নিসর্গের বোবা হাতের 'দিল্লি কা লাড্ডু' প্রতিদিন পাতে পড়ছে, কায়া ছেড়ে ছায়ার ভজনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে মানুষ। জীবনবিমুখ অনেক পণ্যের সয়লাব আস্তে আস্তে মানুষকে যে কোন পাতালনিঁড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে—যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুভব দিয়ে তা যদি শিক্ষিত মানুষজনও বুঝতে না পারেন তবে অমন শিক্ষার ডিটের আগুন জ্বলুক। সকলে উন্নতির মর্ম খাওড়ায়, কিসের উন্নতি কার উন্নতি, কোথায় তার নিবাস।

খুব অল্প বয়সে বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা খুব অস্পষ্ট থাকে। বড়োরাই যেখানে দৈনন্দিন আনন্দ আনোদ খুঁজতে টিভিতে মজে যাচ্ছেন সেখানে বাচ্চাদের কেবল স্তোক দিয়ে বা কৌশলে সরিয়ে কতোদিন চলবে। একটু বড়ো হয়ে কিশোর-কিশোরীরা অপসংস্কৃতি ও দুষ্কৃতিরতার শিকার হচ্ছে। রক্ষণশীল যৌন-নৈতিকতাও অনেক ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কিছু ধরনের অপরাধ প্রবণতাকে উসকে দিচ্ছে। প্রসেনজিৎ চৌধুরীর 'অপসংস্কৃতি ও কিশোর' শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে উদ্ধরণযোগ্য বলে

মনে করছি : 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমাজে প্রধানতঃ দুই ধরনের বিভাজন সৃষ্টি করে—জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ব্যবধান এবং নারী-পুরুষ ব্যবধান। এই ব্যবধান থেকেই জন্ম নেয় দুই বিপরীতধর্মী মানসিক প্রতিক্রিয়া—একদিকে প্রতিবাদী প্রবণতা অন্যদিকে অনুকরণের স্পৃহা। কারণ 'একদিকে পিতামাতার শাসনের জোয়াল থেকে মুক্তি নির্দেশক উপায় হিসাবে সেই জীবনযাপনের ধারাকেই অবলম্বন করা হয় যা তাঁদের অপছন্দ বা অমনোনীত (গল্পত অনুবাদ)। অন্যদিকে অনুকরণের দ্বারা নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে প্রমাণ করার প্রবণতা থেকেও প্রাপ্তবয়স্কধর্মী শিল্প-সাহিত্যের প্রতি কিশোর-কিশোরীর বিশেষভাবে আসক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে' ('মানবমন' / জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪)। সুতরাং কেবল রাখ-ঢাক নয়, নজরে আড়াল নয়—দুধ প্রেম, বাস্তবের শিল্প-সৃষ্টি এবং রুচিকর অভ্যাস নিয়ে বড়োদের জগৎ ও জীবনের ঘটনাবলীকে দেখতে হবে, দেখাতে হবে। এভাবে শিশুরা ক্রমের অনিবার্য দাবিতে আপাতভাবে অকালপক্ক হলেও অপেক্ষাকৃত পরিণত মনস্ক এবং আত্মবিশ্বাসী হতে শিখবে। এতে আখেরে ভালো হবে।

টিভিতে অনেক ফুল বিনোদন-নামধেয় উপস্থাপনা ইত্যাদি দেখতে দেখতে মানুষের নান্দনিক বোধও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দায়াদিনের অনেক অনাচার, ভীরুতাকে সহজ আনন্দে ধুয়ে মাওয় চকচকে পুতুলে রূপান্তরিত হয়ে যায় : কেবল আনন্দই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সকলে মদ খায় না, জুয়া খেলে না, পরনারী বা পরপুরুষের শরণ নেওয়া বিস্তর ঝামেলা তাছাড়া এতে এখনকার সমাজের খোলাখুলি সমর্থন পাওয়া যাবে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প সমস্ত কিছুই সাধনার ব্যাপার, কষ্টার্জিত আনন্দের ফসল। অতো সময়ের কাজ কি। নির্বিরোধী টিভিই পরমাগতি। কিন্তু 'সকটপর্ণে'র আনন্দও পাওয়া যায় আজকাল, পায়রার খোপে বসে ভালো মানুষের নির্বিবাদী আমোদপ্রমোদও ভোগ করা হলো। বহুবচনের গৌরবও বজায় থাকছে। ছোটরা কিছু আর বাই হোক অন্ততঃ বা ভনিতা ছোটবেলা থেকেই বুঝতে শেখে বেশ কিছুটা। অতএব হয় তারাও সামনে-এক-পিছনে-এক হয় অথবা বিদ্রোহী হয়। আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে কারণ এটা গোটা সমাজেরই দুরবস্থা। ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে কাউকে বশে রাখা অসম্ভবেরই নামান্তর বলে পরিগণিত হচ্ছে সর্বত্রই। কেবল টিভির ছবিতে বাচ্চারাও মানবিক দুঃখের সঠিক চেহারা বুঝতে শিখছে না, আদর্শনিষ্ঠ প্রতিবাদ বা বহুমুখবান প্রোহের রূপ বঃ মেজাজ ঠাহর করতে পারছে না। কেবল জরেন্ট এনট্রান্স পাশ করতে পারলেই সুপুত্তুরের ছাড়পত্র—রাজনীতি নোংরা, সমাজ সচেতনার বাণী ব্যাকডেটেড, নৈতিকতা বোকাদের ধর্ম—অনেক বাচ্চা এভাবেই শিক্ষিত হতে চলেছে এখন। আজকাল অনেক দেশেই সাহিত্য শিল্পবিচার সংক্রান্ত বইপত্তর পড়ার অভ্যেস উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেও কমে যাচ্ছে। ৩১।১।৮৭-র স্টেটসম্যান কাগজে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'Strangely enough while there has been a considerable increase in the number of Concert goers, play-goers and even art collectors among the more affluent sections of the community, they have rarely gone for books unless it be for glossies. In other words the level of immediate, faddish entertainment or a kind of exhibition'। সবই Short-cut হয়ে যাচ্ছে,—ক্যাসেটে ম্যাকবেথ, কাউই শুনে নিচ্ছে লোক। সময় কম, 'পথের পাঁচালি' 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' সবই সিনেমায় সারা হয়ে যাচ্ছে। টিভির ছোট পর্দায় আবার দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাতে হচ্ছে, কেবল গল্পই মিলছে লোকে,

অথচ সিনেমার একটা বড়োসড়ো সম্ভাবনার জগৎ গড়াগড়ি যাচ্ছে—ক'জন আর অতো পরিশ্রম করে সিনেমা দেখতে বা বুঝতে চায়। এই সুযোগে জনসাধারণকে মাদকধর্মী কাইটা-কাইটি অবাস্তব নানা লীলাখেলার নিত্যসঙ্গী করে ফিল্মের 'বেওসা' দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও তালকুকে যাচ্ছেন কোথাও, সোপনে ভিড়েই পড়েছেন হয়তো—কাগজ পত্তর পড়ে ধন্দ লাগে।

এ ধরনের একটা সুদূরপ্রসারী ও গভীর বিষয়ে সঠিক রীতিনীতি, কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে কেন্দ্র সরকার থেকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীটিরও সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে এবং সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকেই সাধ্যমতে এগিয়ে আসতে হবে। অসুস্থ, অবাবশ্যিক সমাজ-এর শিল্পে যে কি পাওয়া যায় তা কারোরই অজানা নয় এবং শিশুরা অন্যান্যকর সামাজিক পরিবেশের তথা বিকারগ্রস্ত সংস্কৃতি ক্রিয়ার পরলা নম্বরের শিকার।

যাই হোক, বেলা বক্তগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে ('দূরদর্শন ও তার প্রভাব'—মানবমন, ১৯৭৯ অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা) নিজের মতামতের সপক্ষে 'Television and the Child' ১৯৮৪) এবং 'Television in the lives of children (১৯৮১) গবেষণা নিবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন আমি তা এখানে তুলে দিচ্ছি। উভয় ক্ষেত্রেই (প্রথমোক্ত প্রবন্ধের দু'জন এবং শেষোক্ত প্রবন্ধের তিন জন) অধ্যাপকবৃন্দ দেখিয়েছেন যে "...the greater part of children's T. V. is adult programme e.g. Game drama etc., that T. V. is most often used as a form of entertainment and escape; that T. V. reorganises leisureti me activities, reducing play time and dominating the child's leisure; that too early exposure to violent and stressful programmes is very frightening; that T. V. makes to some extent, children passive; and that T. V. makes its biggest impact when the child can not turn to parents and friends for additional information."

পশ্চিম জার্মানির মতো টিভির বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করে এখনও যদি দূরদর্শনকে ঠিকমতো সংগঠিত করার দাবীতে জনসাধারণ সোচ্চার হয় তবেই টিভি নিয়ে কিছু সত্যিকারের সিরিয়াস ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত ঘটানো যাবে। ভালো রাস্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্রমগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মোটরের মতো দূরদর্শনও গণজীবনকে নানাভাবে ফলবতী করতে পারবে—অবশ্য বেশ কিছু ভাঙাগড়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

('আনন্দবাজার', রবিবার, ১৪ ও ২২শে জুলাই, ১৯৮৮ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

মনোবিদের জন্মনা

মনোবিদ

গত তিন বছর ধরে বিশের অনুপ্রমান এই প্রাণস্পন্দিত গ্রহটিতে তুলকালাম কাণ্ড চলেছে। এই কাণ্ডের নায়ক-নায়িকারা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, চিন্তা করতে সক্ষম ও পরিকল্পিত পরিবর্তনে দক্ষ মানুষ নামক দ্বিপদ জীব। বিবর্তনের শেষ পর্বে এরা একদিকে যেমন অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় নখদন্তের ধারের ও পেশীশক্তিতে অন্য প্রাণীর তুলনায় দুর্বল ও হীন হল, তেমনি অন্যদিকে মস্তিষ্কের বিশেষ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হীনতা-দীনতা মুক্ত হয়ে প্রাণী জগতের ওপর অনায়াসে আধিপত্য চালাতে সক্ষম হল। দলবদ্ধ হয়ে এক সুরক্ষিত জায়গায় বসবাস করে আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতিজ দ্রব্য নখ ও দন্তের বিকল্প তৈরী করতে শিখলো। এই শেখার মাধ্যমে প্রকৃতির বেশ কিছু রহস্যের সন্ধান পেয়ে নিজেদের বিশেষ ধরনের খাদ্য ও নানাবিধ শক্তির অধিকারী হল। কয়েক হাজার বছরের মধ্যে প্রকৃতি বিজয়ের উৎসবে মেতে উঠলো। বিশেষ জ্ঞানলব্ধ প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায়; দলবদ্ধ হয়ে একই ধরনের বিশ্বাস ও ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে একদিকে প্রকৃতি পূজা অন্যদিকে প্রকৃতি বিজয়ে মেতে উঠলো। সৃষ্ট হল স্থান-কাল-অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও সংস্কার। এই সময় বিমূর্ত ভাবতত্ত্বের উদ্ভব ঘটলো মানবমস্তিষ্ক থেকে। এর ফলে একই গোষ্ঠির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবতত্ত্বের ছোট ছোট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং বিবাদ বিসম্বাদের উদ্ভব। যখন পরস্পর অপহরণ ও লুণ্ঠনের ক্ষমতা জন্মালো—(কৃৎকৌশলের উন্নয়নের ফলে) তখন সৃষ্ট হল শ্রেণী-সমাজ। ধর্মের আধিপত্য কিছুটা খর্ব হলেও, বজায় রইলো। এমনি করে গত শতকে প্রথম শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব যেমন তীব্র হলো, তেমনি আবার জাতিভিত্তিক স্বার্থ ও দম্ভ শ্রেণীচেতনাকে কিছুটা স্তিমিতও করে দিল। এরপরেও ঘটলো কৃষিপ্রধান রুশ দেশে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চীনে, পূর্ব ইয়োরোপে বেশ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্নের রাষ্ট্র। ব্যক্তিস্বার্থ শ্রেণী বা সমষ্টি স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান পেল না। 'পার্টি' প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এবং বিত্ত-প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল তথাকথিত গণতান্ত্রিক (মূলত পুঁজিবাদী) রাষ্ট্রে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের বিশেষ সুযোগ দেখা দিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পশ্চিমী অগ্রসর দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ঘটলো বৈপ্লবিক উন্নতি। এই শতকের শেষের দিকে দ্বিতীয় প্রযুক্তি বিপ্লবান্তে যে পরিবর্তনটি বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়ছে সেটা হল পেছিয়েপড়া জাতি ও গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা ও দাবি। যারা কোনো মতে টিঁকে থাকতে পারলেই তুষ্টি বোধ করতো, তারা অগ্রগামীদের সঙ্গে সমকক্ষতা লাভের দাবিতে অস্থির ও সোচ্চার হয়ে উঠলো। সম্পদ ও শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের দাবি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীদের উস্কে তুলতে লাগলো।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক সময়ে মনে হয়েছিল উপজাতি, অধিজাতি, ধর্মীয় গোষ্ঠী—সেটা কেন্দ্রায়েশনের স্বার্থে নিজেদের কথা ভাববে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রখর করে তুললো। বিশেষকরে পেছিয়েপড়া দেশগুলিতে এবং এক সময়ে 'মনোলিথিক' বিবেচিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিপ্লবের ফলে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো, তার ফললাভের আকাঙ্ক্ষা জাগলো তা শুধু অধিজাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যেই এখন আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। একই উপজাতি, অধিজাতি, একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও গড়ে উঠলো আরো অনেক খণ্ড খণ্ড অতিসামান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দল ও গোষ্ঠী। বর্তমানে 'আমাদের বাঁচি বাঁচতে হবে' স্লোগানের মুখর মিছিল ও সভা সমাবেশ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শুধু আমাদের দেশে নয়, সোভিয়েতে, চীনে, আফগানিস্থানে, প্যালেস্টাইনে, কাম্বোডিয়ায়—সব দেশে, সব মহাদেশে।

মানব প্রজাতির জাতিগত, ধর্মীয়, ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্ববিরোধ তো ছিলই; বর্তমানে সেই দ্বন্দ্ববিরোধ সর্বস্তরে, সর্বব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যচেতনা এখন শুধু ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

মহানগরীর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা পাড়া-প্রতিবেশীর উপর নির্ভর না করে, কোনো রাজনৈতিক পার্টি বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও, নিজের কাজের শেষে ও নিজের পরিবার নিয়ে দূরদর্শনের ছোট পর্দার সামনে বসে চিত্তবিনোদন করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে ব্যক্তি-সচেতনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বিশেষ-ভাবে পরিলক্ষমান। কেন্দ্রী বা বিকেন্দ্রীকরণের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে, পার্টি বা গোষ্ঠীর কথা না ভেবে তাঁরা ভোগ্যপণ্য নিয়ে চিন্তায় মগ্নতা। বিপণনে ব্যস্ত এই নাগরিক মানসিকতা যে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, সেই ব্যক্তি-ব্যবধানের, ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতার দল প্রজাতি-সংরক্ষণের সমস্যাকে আরো জটিল আরো দুরূহ করে তুলেছে।

স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তিতে সংক্রামিত হবার ফলে আন্তর্মানবিক সম্পর্কে চিড় ধরছে। অর্থের জৌলুসে অর্থের সবকিছু হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাওয়ার ফলে পরনির্ভরতার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু মানবধর্মের বিচ্যুতি ঘটার সমূহ-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নিউক্লিয়র পরিবারের ব্যক্তি-মানুষ আত্মচিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা পোষণে অক্ষম।

বর্তমানে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রহটি বিশেষভাবে বিপন্ন। একদিক নয়, নানা দিক থেকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধ অসম্ভাব্যের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচুর্য যা বাড়ছে, তার প্রায়ক বেশিরভাগটারই বিনাশী গোষ্ঠী। খাদ্যসংকট শুধু এদেশে নয়, প্রাচুর্যের দেশেও দেখা দিতে পারে। পরিবেশ দূষণ এখন গোটা পৃথিবীর সমস্যা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ তাকে এইসব সামগ্রিক সর্বজনীন সমস্যা থেকে রেহাই দেবে না। এর বিরুদ্ধে শুধু দেশের নয়, সব দেশের জনসমষ্টিকে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামতে হবে। স্বাতন্ত্র্যবোধের বিলাসবাসনা এইসব সমস্যা ছাড়া তৃপ্ত হতে পারে না। এই ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সংগঠিত লড়াই-এর প্রয়োজন।

এই ধরনের পূর্ব-পরিকল্পিত সুসংগঠিত শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা যারা স্বাতন্ত্র্যবোধকে খর্ব করতে না পারলে আজকের দিনের ভুলকালাম কাণ্ডকারখানা আরো বিস্তার লাভ করবে এবং তার ফল, অর্থহীন ধ্বংসলীলা গৃহবিবাদের রূপ নেবে, এমনকি প্রজাতি ধ্বংসের সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

২৫শে বৈশাখ

"দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ-লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পল্লীসেবা পল্লীপ্রকৃতি পৃঃ ৬৫-৬৬)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. দি. এ. ২৫০২/৮৯

MANAB MON
Vol. 28, No. 2

Regd. No. 8570/62
Office of the Registrar of Newspapers for India

Price Rs. 8·00
দাম : ৮·০০

সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রাকর প্রেস ১০/১সি বাবরাটা। ডিএস লেন, কলিকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১০০/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ থেকে প্রকাশিত।